উৎস মানুষ

৩১ বর্ষ • ২য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০১১

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
আত্মায় বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২
আমাদের এখানে চাষ এখন	শুভেন্দু দাশগুপ্ত	৫
রুচিরাম সাহনী	অরবিন্দ গুপ্ত	৮
বিকাশের উৎস যাই হোক উদ্দেশ্য মানুষ	বিবেক দেবরায়	১১
ভিক্ষাপত্র	দিবস দাস	১৪
এখনো গেল না আঁধার	শ্যামল চক্রবর্তী	১৫
প্রাক স্বাধীনতা বাঙলা পত্রিকায় সাম্প্রদায়িকতা	অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী	১৯
পাউডার ও ঘামাচির কথা	জয়ন্ত দাস	২৪
জাপানে ভূমিকম্প ও পরমাণু কেন্দ্রে দুর্ঘটনা	সুজয় বসু	২৬
পুস্তক পরিচিতি	সমীরকুমার ঘোষ	২৯
চিঠিপত্র		৩১

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক,কলকাতা-৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন :৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com
utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

২০০৯ এবং ২০১০—দুটো বছর তিনটে করে সংখ্যা প্রকাশের পর, ২০১১-র জানুয়ারি মাসেও একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। শুরুর সংশয়, সন্দেহ কাটিয়ে মোটামুটি একটা ধারাবাহিকতা আমরা বজায় রাখতে পেরেছি। পুরনো বন্ধুবান্ধবরা, পাঠকরা উৎসাহ দিচ্ছেন। তার জোরেই ঠিক হয়েছে বছরে চারটে করে সংখ্যা প্রকাশিত হবে। যাঁরা পত্রিকা হাতে পাচ্ছেন, তাঁরা অন্যকে জানিয়ে দিন 'উৎস মানুষ' এখনও বেঁচেবর্তে আছে। প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সব 'ভক্ত' বর্তমানে প্রকাশিত উৎস মানুষ পত্রিকাকে প্রকাশ বলেই ধরছেন না, তাঁদের কথা আলাদা।

আমরা যে গুটিকয় বুড়ো ঘোড়া পত্রিকাটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, দু বছরের প্রকাশ তাদের বুড়ো হাড়ে ভেলকি না হলেও কিঞ্চিৎ শক্তি জোগাচ্ছে। আর তারই জোরে বহুদিনের চাহিদা 'বিবেকানন্দ অন্য চোখে' এবং 'এটা কী ওটা কেন' বই দুটি ছাপানো গেছে। কাজ চলছে 'শেকল ভাঙা সংস্কৃতি'র পুনর্মুদ্রণের। অশোকদার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলো নিয়ে সঙ্কলন প্রকাশের সঙ্কল্প এখনও ত্যাগ করিনি। পত্রিকার পাতায় সেগুলো ছাপানোর মাধ্যমে তারই সলতে পাকানো শুরু হল।

পাঠকেরা খুশি হবেন বহুদিন পরে বিবেক দেবরায় ও শুভেন্দু দাশগুপ্তের মতো পুরনো বন্ধুদের লেখা পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যে সুনামি-ধ্বস্ত জাপানে পারমাণবিক চুল্লিতে বিপর্যয় পুরনো আশঙ্কাকেই প্রমাণ করে দিয়েছে। সুলভ, নিরাপদ শক্তির বেলুনটি গিয়েছে ফেঁসে। একে সামনে রেখেই আমাদের প্রতিবাদী কণ্ঠগুলোকে আরও উচ্চকিত করে তুলতে হবে। যাতে আর কোথাও না এভাবে বেঘোরে প্রাণ দিতে হয় মানুষকে।

সম্পাদকমণ্ডলী

‘আত্মা’য় বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

এ কথা সত্যি ‘উৎস মানুষ’ এক সমবেত উদ্যোগের ফসল। কিন্তু তার চালিকা শক্তিটির নাম ছিল অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক নয় উৎস মানুষ বরাবরই লেখাকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। আর এই লেখাকে সৃষ্টিশীল সম্পাদনায় ত্রুটিমুক্ত ও সুখপাঠ্য করে পাঠকের দরবারে হাজির করার গুরুদায়িত্বটি আমৃত্যু পালন করে গেছেন ‘অশোকদা’। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং চাকুরির পদের ভারীসারি ওজন এবং পত্রিকা সূত্রে যে বিপুল পরিচিতি ছিল তার জোরে একজন নামী বিজ্ঞান লেখক হয়ে ওঠা তাঁর কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তিনি কোনো দিনই তা চান নি। তাঁর লেখনী প্রতিভা রয়ে গেছে সম্পাদনা-কর্মের আড়ালে। তবুও নানা জনের অনুরোধে এদিক-ওদিক কিছু লেখা তাঁকে লিখতেই হয়েছিল। সহজ গদ্য, সুচারু বিশ্লেষণ, তথ্য আর মেধার রসায়নে সে লেখাগুলি হয়ে উঠেছিল এক-একটি হীরকখণ্ড। আমরা ছড়ানো-ছেটানো সেই সব লেখা জোগাড় করে আপাতত পত্রিকার পাতায় মুদ্রণের উদ্যোগ নিয়েছি। উজ্জ্বল এই উদ্ধার প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে আমাদের বিনম্র প্রণতি।

নিখুঁত একটা কাচের ঘর তৈরী করা হয়েছে, সামান্য একটা ফুটো বা ফাটাও নেই তাতে। তার ভেতর শুয়ে আছে মৃত্যুপথযাত্রী একটি মানুষ, মৃত্যু প্রায় আসন্ন, খাবি খাচ্ছে বলা যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা। তারপরই লোকটির শেষ নিঃশ্বাস পড়ল, সে মারা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কাচের ঘরের একটা দেওয়ালের কোণা ফেটে গেছে। অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত হল, সদ্য মৃত মানুষটির অদৃশ্য আত্মা বা প্রাণবায়ু ওই কাঁচের ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে।...

এরকম একটা পরীক্ষার কথা অনেকেই শুনে থাকবেন, অনেকে বিশ্বাসও করেন। অথচ কে কোথায় কবে এই পরীক্ষা করেছে, কোন্ নির্ভরযোগ্য বইতে এই পরীক্ষার বিবরণ রয়েছে, —এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না, স্রেফ মুখে মুখে ছড়িয়েছে গল্প। যাঁরা আত্মায় বিশ্বাস করেন, মৃতের দেহ থেকে চোখে-না-দেখা আত্মার ওরকম উড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরীক্ষা-কাহিনীতে বিশ্বাস করেন, তাঁরা একবার ভেবেও দেখেন না ওই তথাকথিত ‘বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার’ বিশ্বাসযোগ্যতা কতখানি, সন্দেহ করেন না এর সত্যতায়। আর এটাই হল মুশকিল। ভূত, আত্মা বা দেহাতীত শক্তিতে যারা বিশ্বাসী তাদের ওই বিশ্বাসটাই ভরসা, যাচাই বিচার প্রশ্ন প্রমাণ দিয়ে সত্য নিরূপণ করার অভ্যাস বা ইচ্ছা তাদের থাকে না। অথচ চারপাশের দুনিয়া দ্রুত এগোচ্ছে, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি আর প্রাচীন ধ্যান-ধারণায় আটকে নেই, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন এক পা-ও এগোতে পারে না, ফলে যে কোনো প্রাচীন বিদ্যা, প্রাচীন ধারণা, প্রাচীন ঐতিহ্যকে এ যুগেও টিকে থাকতে হলে বিজ্ঞানের ছাড়পত্র নিতে হচ্ছে। বিজ্ঞানের পোশাক-আশাক গায়ে না চড়ালে যেন কোনো বিশ্বাসকেই আর নিজের পায়ে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। অতএব ‘আত্মা’কে দাঁড় করাতে ‘বিজ্ঞানের পরীক্ষা’র সাহায্য নিতে হচ্ছে। কিন্তু গোলমালটা হল—আদতে যে আত্মার কোন অস্তিত্বই নেই, বৈজ্ঞানিক বিচারে যার প্রমাণসিদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না, তাকে নিয়ে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে (scientific method) পরীক্ষা করা যায় কী করে? সে তো বাতাসে প্রাসাদ রচনা হয়ে যায়! তাই একটাই রাস্তা আত্মা-প্রবক্তাদের কাছে খোলা থাকে—বানানো পরীক্ষার গুজব প্রচার করে বিশ্বাসী দুর্বলচিত্ত মানুষের আস্থা অর্জন করা। কাচের ঘরের দেওয়াল ফাটার পরীক্ষাটাও তাই, নিছক অপ্রমাণিত অসমর্থিত অবিশ্বাস্য এক ভিত্তিহীন প্রচার কাহিনী।

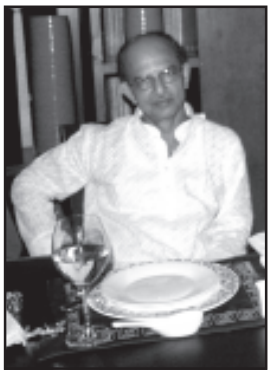

আসলে আত্মা বা অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি মানুষের বিশ্বাস মনের খুব গভীর স্তরে কাজ করে। ভূত প্রেত পেত্নি শাকচুন্নিরা আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার জ্বালাতনে মোটামুটি বিতাড়িত হয়েছে বলা যায়, ছোট বাচ্চারাও আজ আর ভূতে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ‘স্পিরিট’ বা আত্মার প্রতি দুর্বলতা কেবল ব্যক্তিমনে নয় সাংস্কৃতিক মনেও বিরাজ করে। এর অন্যতম কারণ হল সমাজে ধর্মীয়

ঐতিহ্যের প্রভাব আর মানুষের মৃত্যুর সাথে জড়িত রহস্য ও আবেগ। তথাপি বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফসল যদি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার ও বিচারশীল বস্তুবাদী মন তৈরিতে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহলে বোধ করি আত্মা নামক অবাঞ্ছিত অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে মানুষ নিজেই ঝেড়ে ফেলতে পারে।

জীবিত মানুষের দেহে আত্মা'র বাসস্থান নিয়েই প্রথম সন্দেহের সূত্রপাত হয়। আত্মা কোথায় থাকে? আত্মা বা প্রাণবায়ু যদি মৃত্যুর সময় দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই মৃত্যুর আগে জীবিত দেহের মধ্যেই কোথাও থাকবে! কিন্তু মানবদেহের প্রাণ এবং যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচয় এখন জীববিজ্ঞানের বই-এর সুবাদে স্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে; অঙ্গ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা (Anatomy) আমাদের দেহযন্ত্রের আনাচ-কানাচের খবর জেনে ফেলেছে; সি টি স্ক্যান (Scan) বা অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে শরীরের নিভৃততম কোণেরও ছবি তোলা যাচ্ছে—কোথাও আত্মার কোনও হদিশ নেই। বিজ্ঞানের পরিভাষায় মৃত্যু মানে হৃদযন্ত্র থেমে যাওয়া, মস্তিষ্কের স্নায়বিক ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যাওয়া, ও দেহে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাওয়া, ব্যস্। এছাড়া অন্য কোন ঘটনা মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত নয়; ঠিক মৃত্যু-মুহূর্তে ফুরুৎ করে বায়বীয় কিছু উড়ে বেরিয়ে যাওয়া নেহাৎ হাস্যকর ব্যাপার।

মৃত্যুর পরে প্ল্যানচেটে বসে ঊর্দ্ধলোক থেকে মৃতের আত্মাকে ঘরে ডেকে আনা এবং অন্ধকারে কথোপকথন চালানো তাই অসম্ভব, অবাস্তব চরম অবৈজ্ঞানিক ঘটনা। এরকম হতে পারে না। যদি কারুর অভিজ্ঞতায় এরকম প্ল্যানচেটের কথা শোনা যায় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়—কোনো গোপন কৌশল, বা জালিয়াতি কিংবা মোহগ্রস্ত আচ্ছন্ন মন নিজের অজ্ঞাতে প্ল্যানচেটের চাকতি নাড়িয়েছে, নিজের ইচ্ছামত কথা লিখেছে। দেশ-বিদেশে বারবার বহুবার প্ল্যানচেটের 'চিটিং' ধরা পড়ে গেছে, অনেকেই জানেন সে কথা। প্রেতাত্মা প্রেতচক্র নিয়ে চর্চা হয়েছে বিস্তর। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদের প্রচার ও প্রভাব বেশ চাগিয়ে উঠেছিল, কিন্তু ক্রমাগত বিজ্ঞানের প্রসারে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের শাণিত ছুরিতে খান খান হয়ে গেছে যাবতীয় জালিয়াতি আর বিভ্রমের খেলা। উদাহরণ হিসেবে আমাদের দেশীয় নমুনাকে ধরা যায়—অভেদানন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মরণের পরে'। বেশ একটা সমীহ আদায় করেছিলেন এই জনপ্রিয় বইটি তার চমকপ্রদ পরিবেশনার গুণে। প্রেতাত্মার ছবি, অশরীরির অবস্থান, 'এক্টোপ্লাজম' নামক প্রেতমাধ্যমের (যদিও এর কোন উল্লেখ বা অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞানে খুঁজে পাওয়া যায় না) চিত্র দিয়ে পাঠককে বিমোহিত করার আয়োজন হয়েছে। কিছুটা ভক্তিগদগদ বিশ্বাস প্রবণতায় অনেক শিক্ষিত পাঠকও এসব মেনে নেন, কিন্তু এসবই যে সুপরিকল্পিত ফটোগ্রাফিক কৌশল বা 'ট্রিক', আলোকচিত্রীর কৌশলী হাতে অনায়াসেই যে ফটোপ্রিন্টের ওপর তথাকথিত 'আত্মা'র ছবি তৈরি করা যায় (দ্রষ্টব্য: উৎসমানুষ, জানুয়ারি ১৯৯৩ সংখ্যা), সেটা এখন আজ অজানা নয়। একটু বিজ্ঞান সচেতন মন নিয়ে চেষ্টা করলেই আত্মার ফাঁকি বা বুজরুকিটা ধরে ফেলা যায়।

> "একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার 'আত্মা'র শান্তির জন্য কত না পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম আচার নিয়ম আজও সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অপ্রমাণিত অস্তিত্বহীন অযৌক্তিক আত্মার প্রতি দুর্বলতার কারণে অতি বড় শিক্ষিত সজ্জন প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানীও মুন্ডিত মস্তকে কাছা ধারণ করে হবিষ্যি করেন, পরিবারের সকলকে আনুষঙ্গিক বিষণ্ণ শুষ্ক নিয়ম পালনে বাধ্য করেন (যদিও এই বাধ্যতা প্রায় সকলেই স্বেচ্ছায় মেনে নেয়)। এ যেন স্বজন বিয়োগের বিষাদ ডেকে ডেকে বিজ্ঞাপনের মতো দেখানো—দেখ হে, আমি কত দুঃখী, আমার প্রিয়জন মরেছে! ..."

মৃত্যুর পরে মানবদেহের পরিণতি কী হয় সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য রয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ময়না তদন্ত সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকে। সাধারণ ভাবে, হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটবার ঘণ্টা দুয়েক পর থেকে মৃতদেহ শক্ত হতে শুরু করে, যাকে বলে রাইগার মর্টিস (rigor mortis); প্রায় ২৪ ঘণ্টা দেহ শক্ত থাকে। মৃত্যুর ১৮-২০ ঘণ্টা পর থেকে শরীরের অভ্যন্তরের সক্রিয় জীবাণুগুলি রক্ত কোষকলা ও বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের মধ্যে জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে গ্যাস তৈরি করে ও ফলে মৃতদেহটি ক্রমশ ফুলতে থাকে। এ কাজটা চলে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত। এরপর মৃতের দেহকোষ থেকে বিভিন্ন উৎসেচক বা এন্‌জাইম অবাধে নির্গত হয়ে কোষকলার জারণ শুরু করে ফলে দেহের পচন শুরু হয়। এভাবে, মৃত্যুর ৪৮ ঘণ্টা পর দেহ পচে গলে যেতে থাকে। ...অর্থাৎ কোথাও কোন আধিভৌতিক বা পারলৌকিক ঘটনার সুযোগ নেই; একটি দেহযন্ত্রের জাগতিক মেয়াদ শেষ হলে এই বাস্তব জগতেই তার পর্যায়ক্রমিক পরিণতি ঘটে। এই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান প্রমাণিত সত্য, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যাচাইযোগ্য, কোন দ্বিধা বা রহস্যের অবকাশ নেই।

অথচ একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার 'আত্মা'র শান্তির জন্য

কত না পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম আচার নিয়ম আজও সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অপ্রমাণিত অস্তিত্বহীন অযৌক্তিক আত্মার প্রতি দুর্বলতার কারণে অতি বড় শিক্ষিত সজ্জন প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানীও মুন্ডিত মস্তকে কাছা ধারণ করে হবিষ্যি করেন, পরিবারের সকলকে আনুষঙ্গিক বিষণ্ণ শুষ্ক নিয়ম পালনে বাধ্য করেন (যদিও এই বাধ্যতা প্রায় সকলেই স্বেচ্ছায় মেনে নেয়)। এ যেন স্বজন বিয়োগের বিষাদ ডেকে ডেকে বিজ্ঞাপনের মতো দেখানো—দেখ হে, আমি কত দুঃখী, আমার প্রিয়জন মরেছে! ...কথাগুলি এমন তরল তাচ্ছিল্যের সুরে বলতে হয় কারণ শ্রাদ্ধ বা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম কোনমতেই একজন শিক্ষিত, সচেতন, বিজ্ঞানের ন্যূনতম পাঠের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিকে মানায় না। তথাপি শুধুমাত্র লোকাচার আর সামাজিক রীতির দোহাই দিয়ে স্রেফ নিয়ম রক্ষার্থে এগুলি পালন করা হয় অজ্ঞ অন্ধের মতো (কট্টর নিন্দুকেরা বলেন, শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে দুঃখ দুঃখ মুখ করে যোগ দিলেও নিমন্ত্রিতদের মনে লুকানো ফূর্তি থাকে কারণ শ্রাদ্ধে কোন প্রেজেন্টেশনের খরচা নেই, নিখরচায় খাওয়া)। আধুনিকতম যুগেও প্রচলিত এই লোকাচার আরেকবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কত পুঁথিগত, কত জীবন বিচ্ছিন্ন, কত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবঞ্চিত।

যান্ত্রিক প্রথাগত শিক্ষা আর বস্তুগ্রাহ্য যুক্তিশীল চেতনার দুটি সমান্তরাল ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে আসছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। ভারতীয় ঐতিহ্যে চার্বাক দর্শন এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ। প্রায় হাজার দেড়েক বছর আগেই এদেশে ভাববাদী ন্যায়, বৈশে, মীমাংসা, বেদান্তের পাশাপাশি বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের দৃপ্ত চিন্তা উচ্চারণ করেছে আত্মা ও পারলৌকিক ক্রিয়ার অর্থহীন অযৌক্তিকতা। চার্বাকগণ বলেছেন, 'ঋক, যজুঃ সাম বেদত্রয়, অগ্নিহোত্র, ত্রিদণ্ড, ভস্মগুণ্ঠন ইত্যাদি বুদ্ধি পৌরুষহীন চতুরগণের জীবিকার উপায় মাত্র। শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্ন ব্যঞ্জন বস্তুসামগ্রী দিয়ে যদি মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি হয় তবে দূর দেশযাত্রীর সঙ্গে পাথেয় কেন দিয়ে দেওয়া হয়, বাড়ির মধ্যে তার শ্রাদ্ধ করলেই তো চলে! পৃথিবীর মাটির ওপর প্রদত্ত শ্রাদ্ধান্নে যদি উচ্চলোকের স্বর্গবাসীর তৃপ্তি হয়, তবে ঘরের লোকেদের অট্টালিকার ছাদে তুলে দিয়ে তাদের আহার্য নীচে মাটিতে দিলেই তো হয়! ... পরলোকই যেখানে নেই, সেখানে যাগযজ্ঞ আর অনুরূপ পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান কেবল দানদক্ষিণা আদায়ের ফন্দি।' [চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ১৯৮২, পৃঃ১৯, ১৬৬, ১৯৯২]

চার্বাকদের মত এরূপ দুঃসাহসী উগ্রবাদী চিন্তা প্রচারের সাহস আজকের যুগেও খুব বেশি মানুষের নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস অবধারিতভাবেই প্রাচীন অযৌক্তিক ধারণার অচলায়তনে ধাক্কা দিয়েছে বারবার। ১৮৫৯ সালে লেখা হল চার্লস্ ডারউইনের বৈপ্লবিক চিন্তার ফসল 'অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিন্‌স্ অফ ন্যাচারাল সিলেকশন'। বলা চলে মানুষের চেতনার জগতে এক বিস্ফোরণ। এতাবৎকাল বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন নিশ্চিন্তে; সবাই জানতো মৃত্যুর পর মানব-আত্মা সেই ঈশ্বরেই বিলীন হয়; অমোঘ বিশ্বাস ছিল প্রাণীকুলের মধ্যে কেবলমাত্র মানুষেরই আত্মা আছে, অন্য কোন প্রাণীর নেই। ডারউইন এসে সব তছনছ করে দিলেন, আমূল উপড়ে দেওয়া হল, মানুষ সৃষ্টি আর মানবাত্মার যুগপ্রাচীন ধ্যান ধারণা।

সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আজ আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এগিয়ে এসেছি, কিন্তু মনের ভেতরকার অন্ধকারকে যথেষ্ট কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

মানুষের জীবন ও মৃত্যু অতিমাত্রায় বাস্তব। নিজস্ব যুক্তিসমর্থিত বিচারবুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্মত ধ্যান-ধারণার বিকাশই মানুষের জীবনকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে পারে, নাহলে প্রতারিত হতে হয় বারবার। অবাস্তব আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস নয়, কেবল আপন আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসই আমাদের এই কঠিন দুনিয়ায় নিত্য জীবন-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে।

প্রসঙ্গ: পারলৌকিক ক্রিয়া (যুক্তির নিরিখে)—সম্প্রীতি
(কল্যাণগড়), পোঃ হরিপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

সার্ধজন্মশতবর্ষে রবিপ্রণাম

আমার যা আছে
সুপ্তি চক্রবর্তী

ব্যতিক্রমী কণ্ঠে আটটি রবীন্দ্রগানের অনন্য সংকলন
পরিচালনা : দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায়
সি ডি প্রাপ্তিস্থান: বই-চিত্র
(কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের তিনতলা)
জ্ঞান বিচিত্রা মিউজিক ওয়ার্ল্ড, আগরতলা
যোগাযোগ: ৯৮৩৬৮১৩৭৩০, ৯৮৭৪০২৫৩৪৬

আমাদের এখানে চাষ এখন

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

ভারতের কৃষিতে সংকট ছিল। সংকট আছে এবং এ ভাবে চললে সংকট থাকবে। এমন একটা কথা দিয়ে লেখাটা শুরু করা যায়।

কৃষিতে সংকট মানে কী? উৎপাদন সংকট। উৎপাদন সংকট মানে যে পরিমাণ উৎপাদন হলে চাহিদা মেটানো যাবে, সে পরিমাণ না হওয়া। উৎপাদন বললে হবে না। কী উৎপাদন, কোন শস্য উৎপাদন। খাদ্যশস্য না শিল্পশস্য? খাবার শস্য না শিল্পপণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল কৃষিজ পণ্য? দুটোই লাগে। এখন এভাবে আর ভাগ করা যায় না। খাদ্যশস্যও এখন শিল্পশস্য। এখন কারখানায় খাবার তৈরি হয়। যে শস্য মাঠ থেকে, হাট বাজার থেকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে খাবার বানিয়ে খাওয়া হত, এখন তা কারখানায় নিয়ে গিয়ে খাবার বানিয়ে বাজারে নিয়ে আসা। ফলে তা একদিক দিয়ে শিল্পপণ্য। খাদ্য শিল্পপণ্যের জন্য খাদ্যশিল্প শস্যও এখন শস্য। আরও ভাগ করা যায়। দেশের বাজারের জন্য শস্য, বিশ্বের বাজারের জন্য শস্য। আবার দেশের বাজার একরকম নয়। উচ্চবর্গের বাজার, মধ্যবর্গের বাজার, নিম্নবর্গের বাজার। প্রত্যেক বাজারের জন্য আলাদা আলাদা শস্য। আবার একই শস্যের ভিন্ন ভিন্ন ধরন। আরও একটু এগোই। চাষি যেমন শস্য চাষ করে তেমন শস্য চাষ। আবার বাইরের বাজার যেমন শস্য চায়, তেমন শস্য চাষ। চাষিকে দিয়ে তেমন শস্য চাষ করিয়ে নেওয়া। বাইরের বাজার আবার একটা নয়। বাইরে বলতে ভারতের বাইরে। বাইরে বলতে চাষ এলাকার বাইরে, গ্রামের বাইরে শহর। শহর চাষ এলাকার বাইরেই যে শহর, ছোট শহর। আবার চাষ এলাকার অনেক বাইরে বড় শহর। বড়লোকদের শহর। আবার চাষের ঘর অনুযায়ী চাষ। চাষি যা চাষ করে তাই খায়, যা খায় তাই চাষ করে। নিজের জন্য চাষ। তেমন শস্য চাষ।

জোগানের দিকে চাষি। চাষির আবার নানা ভাগ। ছোট চাষি, মাঝারি চাষি, বড় চাষি, বর্গাদার চাষি। চাষির ভাগ অনুযায়ী চাষ, চাষি অনুযায়ী শস্য, শস্যের রকম, একই শস্যের নানা ধরন। চাষ অনুযায়ী, শস্য অনুযায়ী উপকরণ। বীজ, সার, কীটনাশক, জল, যন্ত্রপাতি। চাষ অনুযায়ী, শস্য অনুযায়ী বাজার, দাম।

বাজারে অনেকে। ছোট আড়তদার, বড় আড়তদার, কল মালিক,বড় ব্যবসাদার, ছোট ব্যবসাদার। সরকারের বাজার, বেসরকারি বাজার, সরকারি ক্রেতা, বেসরকারি ক্রেতা, ছোট বেসরকারি ক্রেতা, বড় বেসরকারি ক্রেতা।

এরাই আবার চাহিদার দিকে। এরা যেমন যেমন চাষি চাষ করে তেমন তেমন নিয়ে নেয়। আবার এরা যেমন যেমন চায়, তেমন তেমন চাষিকে দিয়ে চাষ করিয়ে নেয়।

চাষির ওপর চাষ ছেড়ে দিলে চাষির চাষ পদ্ধতির ওপর চাষ ছেড়ে দিতে হয়। চাষির বীজ, দোকান থেকে কেনা কিংবা নিজের কাছে থাকা, দোকান থেকে কেনা সার। কীটনাশক, যেখান থেকে হোক জল নেওয়া, যেখান থেকে পাওয়া যায় টাকা নেওয়া মানে ধারে নেওয়া এই সব নিয়ে চাষির চাষ।

এই চাষিরা তাদের চাষের জন্য সরকারের কাছ থেকে সহায়তা চায়। বীজের, সারের সহায়তা, সেচের জলের সহায়তা, ঋণের সহায়তা, দামের সহায়তা, শস্য গুদামে রাখার সহায়তা, বাজারে পৌঁছে যাওয়ার সহায়তা, ঠিকঠাক দাম পাবার সহায়তা। সরকার এসব দেয় এবং দেয় না। দিলে সবটা দেয় না, ঠিক সময়ে দেয় না, ঠিকভাবে দেয় না। দেয় অথচ চাষির হাতে পৌঁছয় না।

সরকার সহায়তা না দিলে চাষির সমস্যা। এইখানেই সবুজ বিপ্লব। দ্বিতীয় সবুজ, চির সবুজ বিপ্লবকে নিয়ে আসা যাক।

সবুজ বিপ্লব মানে বিশেষ ধরনের বীজ, যার নাম উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক, মাটির তলার জল, চাষের যন্ত্রপাতির ব্যবহার। এর ফলে কী কী হল তার সবটা বলার আগে এক কথায় বলে নেওয়া যাক এর ফলে চাষের খরচ বাড়ল। বীজ কেনা, রাসায়নিক সার কেনা, রাসায়নিক কীটনাশক কেনা, নিজে খরচ করে জল তোলা, কিংবা অন্যের তোলা জল দাম দিয়ে কেনা। যে পরিমাণ খরচ বাড়ল, সেই পরিমাণ ফসলের দাম বাড়েনি। চাষির লোকসান হল। পরের বার চাষের জন্য টাকা ধার করতে হল। পরের বারও দাম পাওয়া গেল না। ধার বাড়ল। শোধ করার জন্য জমি বেচে দেওয়া। নিজের চাষ থেকে অন্যের চাষে জনমজুর হয়ে যাওয়া। তা না পারলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া যা পাই তাই করি করতে। খুব বেশি ঋণ হলে মহাজন চেপে ধরলে আত্মহত্যা করা। এটার অন্য একটা দিক আছে। ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে ভূমিহীন চাষিকে জমি দিয়ে ছোট চাষি বানানো হয়েছিল। বর্গাচাষিকে বর্গাদারি আইনের মধ্যে দিয়ে জমিতে চাষে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। এর একটা কারণ ছোট চাষিই খাদ্যশস্য চাষ করে, নিজের জন্য, অন্যদের জন্য। ছোট চাষিই সবচেয়ে বেশি ফসল ফলায়, প্রতি জোত পিছু ফসলের পরিমাণ হিসাবে। খাদ্যশস্যের স্থানীয় চাহিদা যোগানের একটা ভারসাম্য, একটা স্থিতি আনা হয়েছিল। এর ঠিক উল্টোদিকে

সবুজ বিপ্লব। সবুজ বিপ্লব এমন এক চাষ পদ্ধতি যার খরচ বেশি, যা চোট চাষির পক্ষে চালানো সম্ভব নয়। ফলে চাষ থেকে ছোট চাষির সরে যাওয়া। তার মানে খাদ্য শস্যের চাষ কমে যাওয়া। তার মানে স্থানীয় খাদ্য ঘাটতি। এর সঙ্গে অন্য একটা বিষয় যোগ করতে হবে। চাষের পরিমাণ নির্ভর করে জমির উর্বরতার ওপর। সবুজ বিপ্লবে রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করে জমির স্বাভাবিক উর্বরতার ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি পূরণ করতে আরও বেশি বেশি করে রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়েছে। জমির আরও উর্বরতা কমেছে। ফলে জোত পিছু ফসল উৎপাদনের হার কমেছে। চাষের খরচ বেড়েছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে চাষের জলের বিষয়টা। সবুজ বিপ্লব যে ধরনের চাষ পদ্ধতি নিয়ে এলো তাতে প্রচুর জল লাগে। প্রথমে মাটির ওপরের জল ব্যবহার করা হলো। নদী নালা খাল বিল জল ব্যবহার করে করে শেষ। সরকার এই ধরনের সেচ ব্যবস্থায় মন দেয়নি। যাতে মন দিয়েছে সেটা নদীর ওপর বাঁধ বসিয়ে সেচের জল ছাড়া। নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে নদীর জল আটকানোয় নদী গেল শুকিয়ে। নদী থেকে পাওয়া স্বাভাবিক সেচের জল পাওয়া কমে গেল। বন্ধ হয়ে গেল। ফলে এবার মাটির তলার জল টেনে টেনে তোলা। জল কমেছে যত, জল পাবার জন্য মাটির তত তলায় যাওয়া হয়েছে। খুব নিচে থেকে জল তোলার খরচ বেশি। সেই খরচ যারা করতে পেরেছে তারা জমিদারের মতো জলদার হয়ে উঠেছে। জল বেচেছে। ছোট চাষি মাঝারি চাষি জল কিনেছে, কিনতে বাধ্য হয়েছে। তাদের খরচ বেড়েছে। খরচ বাড়ায় চাষ ছেড়ে দিয়েছে।

অন্য দিকে জলের অভাবে জমির ক্ষতি হয়েছে। মাটির ঠিক নিচে জল থাকায় জমির যে উর্বরতা তা নষ্ট হয়েছে। জমি শুষ্ক হয়েছে, জমির লবণাক্ততা বেড়েছে। চাষ নষ্ট হয়েছে। চাষের জমি কমেছে। চাষের জমি কমায় চাষ কমেছে।

অন্য একটা ব্যাপার হয়েছে। মাটির ঠিক নিচের জল না থাকায় লতা, গুল্ম, ঘাস, তৃণ, ছোট উদ্ভিদ জন্মায় নি। এই সব শস্য গবাদি পশুর খাদ্য। তাদের খাদ্যে ঘাটতি হয়েছে। এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় আর একটা কথা। সবুজ বিপ্লবের ধান চারা উচ্চফলনশীল ধান গাছ লম্বায় ছোট, তার গায়ে মিশে থাকা রাসায়নিক কীটনাশক। ফলে গ্রামে কমে গেছে গবাদি পশুর সংখ্যা। পুরনো চাষে চাষ ও গবাদি পশুর মধ্যে নানা ধরনের সম্বন্ধ ছিল। নতুন চাষে তা ভেঙে গেল। ছোট চাষি, মধ্য চাষির সমস্যা হলো।

সবুজ বিপ্লব স্থানীয় চাষে আর একটা সমস্যা তৈরি করেছে। সবুজ বিপ্লব মানে ধান আর গম। এই দুটো চাষে জোর দিতে গিয়ে অন্য অন্য খাদ্যশস্য চাষকে অবহেলা করা হয়েছে। প্রত্যেকটা অঞ্চলে জলবায়ু, আবহাওয়া, মাটির গুণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি অনুযায়ী অসংখ্য ধরনের খাদ্যশস্য ছিল। যা চাষ করা হতো আবার এমনিই হতো। এই খাদ্যবৈচিত্র্য এক একটা অঞ্চলের অধিবাসীদের বাঁচিয়ে রাখতো। এদের খাদ্যগুণ ছিল, ঔষধ গুণ ছিল। সবুজ বিপ্লবের চাষ এদের ক্ষতি করলো। সবাইকে ধান গম চাষে, ধান গম খাদ্য অভ্যাসে, ধান গম চাষ অর্থনীতিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। স্থানীয় খাদ্য সার্বভৌমত্ব, স্থানীয় খাদ্যের জোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করে দেওয়া হলো।

যত চাষ অর্থনীতিতে ছোট চাষির সমস্যা বেড়েছে তত বেশি করে তাকে বাইরের আর্থনীতিক শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ঘুরিয়ে বলা যায় তত বেশি করে বাইরের আর্থনীতিক শক্তি চাষে আধিপত্য তৈরি করেছে। একটা উদাহরণ এই রকম। ছোট চাষির চাষ করার খরচে টান পড়েছে। গ্রামের ছোট আড়তদার তাকে টাকা দিল বিনিময়ে চুক্তি করলো তার পুরো চাষটাই আড়তদার নিয়ে নেবে আগে থেকে ঠিক করা একটা দামে। ছোট আড়তদার আগাম টাকা পেয়েছে বড় আড়তদারের কাছ থেকে। সেই টাকারই একটা অংশ দিয়েছে চাষিকে। এবার একাধিক ছোট আড়তদারের কাছ থেকে শস্য যাবে বড় আড়তদারের কাছে।

ধান হলে বড় আড়তদারের কাছ থেকে ছোট চালকল মালিক, ছোট চালকল মালিক থেকে বড় চালকল মালিক, কিংবা বড় আড়তদারদের কাছ থেকে বড় চালকল মালিক। সেখান থেকে চাল শহরের বাজারে, বড় চাল বিক্রেতাদের কাছে, বিদেশে। অন্য শস্য হলে, বড় মজুতদার, শহরে বড় ব্যবসায়ী, বিদেশে রপ্তানিকারী এইভাবে। এই যে মাঠ থেকে শস্য বেরিয়ে এলো, মাঠের এলাকার লোকেদের জন্য কী পড়ে রইল? কিছু না। চাষি তো আগাম টাকা নিয়ে সবটাই বেচে দিয়েছেন। বাইরে সব পাঠিয়ে দিয়ে ঘরে খাদ্যের অভাব। এটা এক ধরনের চুক্তি চাষ। আগাম দিয়ে শস্য নেবার চুক্তি। চাষির টাকার অভাবের সুযোগ নেওয়া।

এই ব্যবস্থাকে ঘুরিয়ে দেখলে অন্য অন্য ধরনের চুক্তি চাষ দেখা যাবে। আগে চাহিদার দিকটা ঠিক হলো: কি চাই, কি রকমের চাই, কি পরিমাণে চাই, কবে চাই। কোন একটা শস্য। দরকার কারখানার, বাজারের, ব্যবহারকারীর, শহরের, বিদেশের, উচ্চবর্গের, বড় বাজারের। চাহিদার দিকে এরা। এদের চাহিদা বার্তা জোগান সাজানো, শস্য সাজানো, শস্যের ধরন সাজানো, পাওয়ার সময় সাজানো, পরিমাণ সাজানো। সেই মতো মাঠ সাজানো, সেই মতো চাষিকে ধরা। চাষিকে বলা হলো এই শস্য চাই। এই ধরনের শস্য চাই। তুমি তোমার মাঠে এই শস্য ফলাও। এর সবটা আমি কিনে নেবো। তার জন্য তোমাকে আগাম এত টাকা দিয়ে দিচ্ছি। চাষি রাজি হলেন। ব্যস্। এবার চাষ চাহিদাকারীর খপ্পরে। বীজ দেবে চাহিদাকারী, বিশেষ ধরনের বীজ। যে বীজে যে বিশেষ ধরনের শস্য চাওয়া হচ্ছে সেই শস্য পাওয়া যাবে।

বিশেষ ধরনের রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক, যাতে ফসলের যে যে গুণ ও পরিমাণ চাওয়া হচ্ছে তা নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায়। কৃষক রাজি হবেন। হতে বাধ্য হবেন।

যারা চাহিদা তৈরি করলো তারা জোগান নিশ্চিত করলো মাঠে। যারা মাঠ থেকে বাজারে জোগান নিশ্চিত করলো তারা বাজারে এর চাহিদা নিশ্চিত করবে। এই কাজটা করে খুচরো ব্যবসায়ে বৃহৎ পুঁজি। পাইকারী ব্যবসাকারী, পাইকারী ব্যবসায়ে বড় পুঁজি। এরা দেশি ও বিদেশি। বিদেশি খুচরো ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের জন্য দরজা আরও খুলে দেওয়া হচ্ছে। এরা একই সঙ্গে ঠিক করে আমাদের ক্রেতাদের কি চাহিদা করা উচিত এবং উৎপাদকদের কি যোগান দেওয়া উচিত।

একদিন এরাই আবার এই নকশাটা পালটে দেবে। আজ যা ঠিক হলো যদি দেখা যায় কাল তাতে মুনাফার হার কমে যাচ্ছে, তাহলে আর একটা নকশা ঠিক করবে যাতে মুনাফার হার তুলনায় বেশি। সেদিন বলবে, বোঝাবে, বাধ্য করবে, অন্য একটা চাহিদা করতে সেই মতো চাষিকে বলবে অন্য একটা যোগান দিতে।

চাষি এদের কথামতো মাঠ একটা শস্যে ভরে ফেলেছেন। কাল যদি তাকে বলা হয় এই শস্যটা আর লাগবে না, তার মাথায় হাত। মাঠ একটা শস্য থেকে অন্য শস্যে বদলে ফেলা সহজ কাজ নয়। না পারবেন নিজের খাবার শস্য চাষে ফিরে আসতে, না পারবেন নিজের পছন্দ মতো শস্য চাষে আসতে। না পারবেন জলদি বাইরের চাহিদা মাফিক শস্যে যেতে।

অন্যের কথা শুনে চাষ নানা কারণে বদলে যেতে পারে। এক তো বললাম তুলনামূলক মুনাফার নিরিখে। দুই, শস্যের চাহিদা বা পছন্দ বদলে যাওয়ায়, বিকল্প শস্য এসে যাওয়ায়। তিন, দাম নেমে যাওয়ায়। দেশের বাজারে, বিদেশের বাজারের পরিবর্তনে।

নিজের পছন্দ মতো চাষ থেকে অন্যের পছন্দ মতো চাষে সরে গেলে নিজের খাবার শস্য চাষ বন্ধ, স্থানীয় এলাকার খাবার শস্য চাষ বন্ধ। খাবার শস্যের জন্য অন্য সূত্রের ওপর নির্ভর করা ফলে অনিশ্চিয়তা। খাদ্য স্বনির্ভরতা থেকে পরনির্ভরতা। নিজের চাষে নিজের বীজ, নিজের জ্ঞান। অন্যের চাষে চলে গিয়ে নিজের বীজ, নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। চাষ স্বনির্ভরতা থেকে পরনির্ভরতা। অন্যের কথা শুনে চাষে অন্যের দেওয়া বীজ, সার, কীটনাশক। মাটির ক্ষতি, অন্যের চাষে চলে গেলে ক্ষতি পুষিয়ে নিজের চাষে ফিরে আসা সাংঘাতিক কঠিন। প্রায় অসম্ভব।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে এই ধরনের চাষের ওপর জোর। এই চাষের যা বিনিয়োগ, তা ছোট চাষির পক্ষে সম্ভব নয়। এই চাষের পাল্লায় পড়ে ছোট চাষি জমি দিয়ে দেবে বড় চাষিকে। আইনত না পারলে বেআইনী ভাবে। জমির কেন্দ্রীভবন হবে। যা ভাঙতে একদিন ভূমি সংস্কার হয়েছিল সেই অবস্থায় আবার ফিরে আসা।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব নীতিতে নতুন দুধরনের চাষের কথা বলা আছে কোম্পানি চাষ, কর্পোরেট চাষ। এ দুটো নিয়ে বলতে একটু পিছিয়ে শুরু করি। পুঁজি সব সময় বিনিয়োগের জায়গা খুঁজে বেড়ায়। যেখানে মুনাফা হবে, মুনাফা বেশি হবে, আগের বিনিয়োগের জায়গায় হওয়া মুনাফা থেকে বেশি মুনাফা হবে এমন জায়গা খুঁজে বেড়ায়। পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদন করে মুনাফা বানানোর জন্য দরকার প্রযুক্তি বানানো। এখন নতুন যে প্রযুক্তি বানানো হয়েছে, বানানো চলছে তার একটা বড় জায়গা চাষ, শস্য, বীজ, উদ্ভিদ এমন সব মাঠভিত্তিক বিষয়। এই প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে পুঁজি মাঠে আসছে, আসতে চাইছে। মাঠে আগে থেকেই রয়েছে চাষি, ভূমিবাসী। তাহলে মাঠ দখল করতে হলে হয় এদের কব্জা করো, নয়তো হঠাও। দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে এই দুটোই আছে। সরকারি মদতে পুঁজির এই দুটো কাজই চলছে।

প্রথমে চাষিকে দুর্বল করে দাও। চাষির নিজের ক্ষমতার জায়গা বীজ, শস্য, জমি, জল এগুলোর ক্ষতি করো। চাষিকে চাষের জন্য দেওয়া আগের সহায়তা কমিয়ে দাও, তুলে নাও, পৌঁছিয়ে দিও না। চাষি যত দুর্বল হবে, তত বেশি করে সে পুঁজির কব্জায় যাবে, তার কথা মতো চলবে।

সবুজ বিপ্লবে চাষের উপকরণ ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে বাইরের উপকরণ নির্ভর করা হয়েছে। দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে বাইরের পুঁজি, বাইরের শস্য, বাইরের উপকরণ, বাইরের চাহিদা ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে পুরোপুরি বাহির-নির্ভর করে তোলা হলো, হবে।

ফলে চাষি জমি হারাবেন, নিজের চাষ হারাবেন, নিজের উপকরণ হারাবেন, নিজের চাষজ্ঞান হারাবেন, নিজের খাবার হারাবেন, পরিণত হবেন একজন চাষ শ্রমিকে। তারপর একদিন উচ্ছেদ হবেন নিজের গ্রাম থেকে।

বাইরের চাহিদার চাষ গ্রামকে ধ্বংস করবে। গ্রামের জমি, গ্রামের জল, গ্রামের শস্য বৈচিত্র্য, খাদ্য বৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য, সমাজ, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবে।

আমরা এখন এমন দিনের অপেক্ষায় থাকছি। জানতে চাই না, বুঝতে চাই না, প্রতিবাদ করতে চাই না, প্রতিরোধ করতেও চাই না।

উ মা

‘শেকল ভাঙা সংস্কৃতি’ বইটি আবার আমরা বের করছি। খুব শিগগিরই।

রুচিরাম সাহনী: বৈজ্ঞানিক নবজাগরণের অগ্রদূত

(১৮৬৩ - ১৯৪৮)

অরবিন্দ গুপ্ত

বাংলা ভাষান্তর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দিতে আমাদের দেশে সমাজসংস্কারকেরা জনমানসে প্রবল জোয়ার তুলেছিলেন—বাঙলায় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) আর বাঙলার বাইরে জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯০), গোপাল গণেশ আগারকর (১৮৫৬-১৮৯৫), রুচিরাম সাহনী (১৮৬৩-১৯৪৮) প্রভৃতি। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এইসবপ্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা। আমাদের যেটুকু চর্চা প্রধানত তা ওই বিদ্যাসাগর ও রামমোহনকে নিয়ে সীমাবদ্ধ, ইদানীং অবশ্য সুদীর্ঘ উপেক্ষার প্রাচীর সরিয়ে সামনে এসেছেন অক্ষয় কুমার দত্ত। জ্যোতিরাও ফুলে, আগারকর কিংবা রুচিরামরা লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত।

রুচিরাম সাহনী ছিলেন একজন পথিকৃৎ শিক্ষাব্রতী। পাঞ্জাবের সুদূর অঞ্চলে বিজ্ঞানবোধকে জনপ্রিয় ও ব্যাপ্ত করা হল তাঁর মহান কীর্তি। ১৮৬৩ সালের ৫ এপ্রিল, এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ডেরা ইসমাইল খান নামে এক ছোট শহরে তাঁর জন্ম। পাঁচ-ছ বছর বয়সে বিধি-রীতির ছকের বাইরে এক স্কুলে পড়ার পর, তাঁকে পাঠান হল এক ছোট দোকানে আর কারবারে, হাতে কলমে কাজ শেখার জন্য। তারপর ন'-দশ বছর বয়সে শুরু হল তাঁর বাবার দোকানে কাজ করা।

> *"এক একটি নামতা [পাঞ্জাবী ভাষায় পাহারা -অনুবাদক] আমি বাবার সামনে না ভেবে না থেমে গড়গড় করে বলে যেতে পারলেই বাবা পাণ্ডাজিকে দিতেন নগদ চার আনা। এটা ছিল তিনি সাধারণত যা পেতেন পারিশ্রমিক হিসেবে, যেজন্য সব ছেলেকেই প্রতি সপ্তাহে একবার করে দিতে হত নির্দিষ্ট পরিমাণ আটা আর এক টুকরো করে গুড়, তার অতিরিক্ত ... পাণ্ডাকে যখন ছেড়ে গেছি, তখন আমি ২০×৩৫ পর্যন্ত নামতা জানতাম, এমন কি ভগ্নাংশের নামতাও... পাণ্ডাকে ছেড়ে যাবার পর আমি এক সাধারণ দোকানদারের সঙ্গে দু-এক মাস কাটালাম। সেখানে নামতা আর যা সামান্য পাটীগণিত আগে শিখেছিলাম, সবই কাজে লাগাতে হত। যতদূর মনে পড়ে, দামের হিসেব কষতে আমার তেমন কিছু অসুবিধে হয়নি। সম্ভবত আমাকে এ কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য ছিল, স্কুলে আমি যা শিখেছি, সত্যিকারের দৈনন্দিন কাজকারবারে তার মূল্য কতখানি, সেটা উপলব্ধি করাবার ব্যবস্থা করা। ওই নামতাগুলো নিতান্তই স্মৃতিশক্তির চর্চা ছিল না, সেগুলির নিজস্ব ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল প্রচুর এবং সেই প্রয়োগে একটি ভুলের মানে হতে পারে কারবারে একটা বড় রকমের লোকসান। হিসেবগুলো করতে হত দ্রুত ও নিখুঁতভাবে।"*
>
> **রুচিরাম সাহনীর আত্মজীবনী থেকে**

কিন্তু বেশিদিন না যেতেই তাঁর জীবনে এল এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। সিন্ধুনদে বেশ কয়েকটি মালভর্তি জাহাজ ডুবে যাওয়ার ফলে অচল হয়ে গেল তাঁর বাবার ব্যবসা। রুচিরামকে পাঠানো

হল চার্চ মিশন স্কুলে। সেই স্কুলও বন্ধ হয়ে গেল এক বছর পর, তিনজন ছাত্র খ্রিস্টান হবে বলে ঠিক করার পর তাদের বাবা-মায়ের আপত্তিতে। তখন জনসাধারণ একটা নতুন স্কুল খুললেন, যার আর্থিক সংস্থান হত শহরের *মণ্ডি*-তে যে পরিমাণ গম বিক্রি হত, তার থেকে সামান্য কিছু আলাদা করে সরিয়ে রেখে। যখন তাঁর পনের বছর বয়স, রুচিরাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষায় [middle school examination] উত্তীর্ণ হলেন প্রথম স্থান অধিকার করে এবং ঝাঙ [jhang] এর কাছে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে [high school] ভর্তি হলেন। ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন পরই তিনি জানলেন, তাঁর বাবা খুবই অসুস্থ এবং তাঁকে বাড়ি ফিরে কিছুদিন থাকতে হবে। সেই যাত্রা ছিল খুবই কষ্টকর, যাওয়া-আসা ২৫০ কিলোমিটার করে, কখনও গোরুর গাড়ি বা ঠেলাগাড়িতে, কখনও নৌকায়, কখনও উটের পিঠে—অথবা পয়সা বাঁচাবার জন্য পায়ে হেঁটে। তাঁর বাবা প্রয়াত হলেন ১৮৭৯ সালে তাঁর পরিবারকে চূড়ান্ত দুরবস্থায় ফেলে রেখে। রুচিরাম তা সত্ত্বেও ঠিক করলেন, লেখাপড়া চালিয়ে যাবেন। ১৮৮৪ সালে লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বি এ পাস করলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে। তিনি ছিলেন এক তুখোড় তর্কযোদ্ধা [debater]। পাঠক্রমের বাইরে নানা কার্যকলাপে তাঁকে পাওয়া যেত।

আর্থিক প্রয়োজনেই রুচিরাম কলকাতার আবহাওয়া বিভাগে চাকরি নিলেন। তাঁর উৎসাহদাতা অধ্যাপক ওমান-ই তাঁকে পরামর্শ দেন একই সঙ্গে অর্থ ও জ্ঞান অর্জন করতে এবং বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর [Masters] ডিগ্রির পড়া শেষ করতে। কলকাতায় এসে রুচিরাম ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর সঙ্গে আশুতোষ বোস, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বোসের মত বৈজ্ঞানিক ও সমাজসংস্কারকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও আন্তঃক্রিয়া চলতে থাকে। পরে তাঁকে বদলি করা হয় সিমলায় আবহাওয়া বিভাগের সদর দপ্তরে, যেখানে তাঁর কাজ ছিল 'দৈনিক' ও 'মাসিক' আবহাওয়া বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি করা। বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের এক চমকপ্রদ পূর্বাভাস তৈরি করে এবং তার ভিত্তিতে যথাসময়ে সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি একবার বহু জাহাজকে ধ্বংসের থেকে রক্ষা করেছিলেন।

১৮৮৭ সালে সাহনী লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজে সহকারী অধ্যাপক [Assistant Professor] পদে যোগ দেন, পরে তিনি রসায়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হয়েছিলেন। চোখের সামনে পরীক্ষা করে দেখিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতাকে প্রাণবন্ত করে তুলতেন। এর ফলেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক। বিভাগীয় প্রধান, এক ব্রিটিশ অধ্যাপক, সাহনীর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর ইহজীবনে নরকযন্ত্রণার ব্যবস্থা করলেন। প্রবল আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন সাহনী শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করে একটি রাসায়নিক কারখানা খুললেন, কিন্তু সেটা ভালভাবে চলল না। ১৯১৪ সালে সাহনী ইউরোপ যাত্রা করলেন; উদ্দেশ্য তখনকার উদীয়মান বিষয় তেজস্ক্রিয়তা [radioactivity] নিয়ে জার্মানির ডে. ফায়ান্‌স্ [D.Fajans]-এর সঙ্গে গবেষণা করা। কিন্তু সে কাজ নিয়ে গুছিয়ে বসার আগেই শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাঁকে তড়িঘড়ি পালিয়ে যেতে হল ইংল্যান্ডে।

ইংল্যান্ডে সাহনী ঘটনাক্রমে বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী লর্ড রাদারফর্ডের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেলেন, সহযোগী হিসেবে পেলেন নীলস্ বোরকে। প্রফেসর রাদারফর্ডের সহ-রচয়িতা হয়ে তিনি দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। বিষয় ছিল—আলোকচিত্রীর অবদ্রবের মধ্যে আল্‌ফা কণার বিক্ষেপণ [scattering of alpha particles in photographic emulsion]। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংল্যান্ডে পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্কটজনক হয়ে ওঠায় তাঁকে আর দেরি না করে ভারতে ফিরে আসতে হয়।

ফিরে এসে সাহনী যোগ দিলেন পাঞ্জাব সায়েন্স্ ইন্‌স্টিটিউটে (পি এস আই) যুগ্ম সম্পাদক হয়ে। ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডের সাহায্য নিয়ে বাস্তবিক পরীক্ষা করে দেখিয়ে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার মাধ্যমে সারা পাঞ্জাব জুড়ে বৈজ্ঞানিক বোধ ও চেতনার প্রসারের উদ্দেশ্যে পি এস আই-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রফেসর ওমান। সে সময়ের পাঞ্জাব দিল্লি থেকে পেশায়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিমলাতে থাকতেই সাহনী আবহাওয়ার পূর্বাভাস বিষয়ে ধারাবাহিকতাভাবে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বক্তৃতাগুলি বিপুল ও বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিল। গ্রাম শহরের সাধারণ মানুষ, মজুর, দোকানদার সবাই দলে দলে জড়ো হত তাঁদের কাছে। প্রায়ই তারা দু-আনা করে টিকিট কিনত অনুষ্ঠান দেখবার জন্য। এই টিকিটের পয়সায় যাতায়াতের খরচার খানিকটা উঠে আসত। সাহনীর জনপ্রিয় বক্তৃতামালার বিষয়গুলি ছিল সবার পরিচিত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আধারিত—যেমন—*সাবান তৈরি করা, ১৮৮০ র আগে যে জল লাহোরীরা [লাহোরবাসীরা] পান করত, বিশুদ্ধ ও দূষিত হাওয়া, মানুষের সেবায় বিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক প্রলেপন [electroplating], কাচ তৈরি করা, পাঞ্জাব ও তার নদীগুলি* (ব্যাখ্যার সুবিধের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল কাদা দিয়ে তৈরি বন্ধুরতা - মানচিত্র বা রিলিফ ম্যাপ) ইত্যাদি।

বিপুলসংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করবার জন্য এই জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতামালার আয়োজন করা হত বিভিন্ন উৎসবের ও মেলার সময়। বক্তৃতাকে গ্রামবাসীদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য তার প্রকাশভঙ্গি করা হত নাটকীয়। বিজ্ঞান অধ্যয়নে এই বক্তৃতামালা প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। সাহনীর চাহিদা ছিল অফুরন্ত; পাঁচশ'রও বেশি এমন জনপ্রিয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি।

সাহনী ভেবে দেখলেন যে স্কুল-কলেজগুলিতে কোন পরীক্ষাগার নেই। সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম আমদানি করা হত খুব চড়া দামে। ভারতে তৈরি উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের ঘরেই প্রতিষ্ঠা করলেন এক কর্মশালার। এজন্য আল্লাহ্ বক্‌শ্ নামে রেলের এক দক্ষ কারিগরকে [technician] আংশিক সময়ের [part time] ভিত্তিতে নিয়োগ করলেন। এই বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামগুলি প্রায়ই দান করা হত কিংবা যা খরচ পড়েছে সেই দামে বিক্রি করা হত। ছাত্রদের ও শিক্ষকদের মধ্যে পরীক্ষ নিরীক্ষার দক্ষতার উন্নতিতে সক্রিয় সহায়তাই ছিল এর উদ্দেশ্য। সূক্ষ্মতম ও উচ্চমানের প্রায় নিখুঁত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তৈরি করার জন্য কর্মশালায় পরে একটি লেদ মেশিনও [কুঁদযন্ত্র] যোগ করা হয়।

১৮৯৩ সালে প্রফেসর সাহনীকে পুনায় [এখন পুনে-অনবাদক] একটি সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ করলেন খ্যাতনামা সমাজকর্মী শ্রী নামজোশী। সাহনী তাঁর সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রদর্শনের এই চমৎকার সুযোগটি গ্রহণ করলেন। তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করা হল এই সরঞ্জামগুলি পরীক্ষা করে সে বিষয়ে সুপারিশের জন্য। *সেই কমিটি বিশ্বাসই করল না যে এমন যন্ত্রপাতি লাহোরে বা ভারতের অন্য কোন জায়গায় তৈরি হয়ে থাকতে পারে*। সদস্যদের মনে হয়েছে—যন্ত্রগুলি ইংল্যান্ডে তৈরি আর সেগুলি যাতে দেশি দেশি দেখায়, তাই পি এস আই ভারতীয় বার্নিশ দিয়ে রঙ করেছে। সোজা কথায়, তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারলেন না যে এমন সূক্ষ্ম মাপের যন্ত্র আধা খরচে এই দেশেই বানানো যায়।

১৯০৬ সালে কলকাতা শিল্প প্রদর্শনীতে [Calcutta Industrial Exhibition] এক কমিটির সিদ্ধান্তে এই সব বৈজ্ঞানিক প্রদর্শের [exhibit] জন্য স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হয়। এই কমিটিতে অন্যতম বিচারক ছিলেন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু।

সাহনী লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজের রসায়ন বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক [senior professor] পদ থেকে অবসর নেন ১৯১৮ সালে। পরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনেই মগ্ন থাকেন। তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ন্যাসরক্ষক [trustee] ছিলেন দ্য ট্রিবিউন [The Tribune] পত্রিকার, যার প্রকাশ শুরু হয়েছিল লাহোরে। এ ছাড়াও তিনি দয়াল সিং কলেজ ও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

প্রফেসর সাহনীর ছিল পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে। ছেলে বীরবল সাহনী ছিলেন একজন বিশিষ্ট প্রত্ন-উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী [palaeobotanist]। ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এফ আর এস হবার সম্মান পান *Self-revelations of an Octogenarian* [এক অশীতিপরের আত্ম-উন্মোচন] নামে তাঁর আত্মজীবনীতে রুচিরাম সাহনী জীবনের নানা সংগ্রাম ও সংঘাতের প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর নাতি প্রফেসর অশোক সাহনী, একজন প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্, অবসর নিয়েছেন চণ্ডীগড়ে - পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ থেকে। তাঁর নাতনী প্রফেসর মোহিনী মল্লিক কানপুর আই আই টির প্রজন্মের পর প্রজন্মের ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছেন প্রতীকী তর্কবিদ্যায় [Symbolic Logic] তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। ১৯৪৮ সালের ৩ জুন বম্বে [এখন মুম্বই] শহরে ৮৫ বছর বয়সে জীবনাবসান হল পাঞ্জাবে বৈজ্ঞানিক নবজাগণের অগ্রদূত প্রফেসর রুচি রাম সাহনীর।

অনুবাদকের টীকা:

Cart এর বাংলা করা হয়েছে গোরুর গাড়ি, পশুচালিত গাড়ি লিখলে অনুবাদ আরও বিশ্বস্ত হত।

FRS - Fellow of the Royal Society

IIt - Indian Institute of Technology

(ক) ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ, (খ) প্রচলিত বাংলা লিপ্যন্তর এবং (গ) ইংরেজি শব্দের কাছাকাছি মান্য উচ্চারণ

(ক)	(খ)	(গ)
Government	গভর্নমেন্ট	গাভ্‌ন্‌মান্ট
College	কলেজ	কলিজ্
Science	সাইন্স	সাইআনস
Professor	প্রফেসর	প্রা ফে সা

আ বা আ-কার (া) এর নিচে রেখা থাকলে উচ্চারণ হ্রস্ব আ, না থাকলে পুরোপুরি আ উচ্চারণ, যেমন butter - বাটা

আমরাই প্রথম

ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে দেশজুড়ে এক সমীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার খরচ পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি। প্রাইভেট টিউশনি ও নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যা খরচ হয় তাতে আমাদের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মোট খরচের ৪০ শতাংশ চলে যায় প্রাইভেট টিউশনিতে। অর্থাৎ আমরাই এ ব্যাপারে প্রথম! গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্নাটকের মতো বড় রাজ্যগুলিতে স্কুলের মাইনে, বই-খাতা, গাড়ি-ভাড়া বাবদ ছাত্রছাত্রীরা যা খরচ করে তা প্রাইভেট টিউশন নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অনেকটাই কম। যেমন বিহারে ২১%, ওড়িশায় ২০%, গুজরাটে ২০%, মহারাষ্ট্রে ১৬% আর ঝাড়খণ্ডে ১৫%। পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মোট খরচের ৪৮% চলে যায় প্রাইভেট টিউশনিতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০২-এ স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশনি করাকে বেআইনি ঘোষণা করে। আবার ২০০৫-এ রাজ্য সরকার শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য এক আচরণবিধি (Code of Conduct) চালু করে। এই আচরণবিধি মেনে চলবে, অর্থাৎ প্রাইভেট টিউশনি করবে না বলে মুচলেকা নেওয়া হয়। মাইনে কাটা, চাকরি চলে যাওয়া এ-ধরনের শাস্তির বিধানও ছিল আচরণবিধিতে। কিন্তু প্রাইভেট টিউশনিও সমান তালে বেড়েছে বই কমেনি। কারও শাস্তি হয়েছে বলে শোনাও যায়নি। উল্টে শিক্ষক সমাজের প্রতিবাদে সরকারকে পিছিয়ে আসতে হয় তার সিদ্ধান্ত থেকে।

সংবাদ সূত্র: টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৮/১/২০১১

বিকাশের উৎস যাই হোক, উদ্দেশ্য মানুষ

বিবেক দেবরায়

শাসক দল, অর্থাৎ কংগ্রেসের, জনৈক সাংসদের সঙ্গে সম্প্রতি কথা হচ্ছিল। তাঁর একটা প্রশ্ন। এ বছরের বাজেটে বলা হয়েছে—২০১১-১২ সালে বাস্তবিক জাতীয় আয় ৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় আয় বস্তুটি কী? আমাকে যাঁরা ভোট দেন, তাঁরা তো আর জাতীয় আয় বোঝেন না। জাতীয় আয় বৃদ্ধির ব্যাপারটা তাঁদের কীভাবে বোঝানো যায়? তাঁদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসছে কি? প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, অর্থনীতি ও রাজনীতি, দুটোই জড়িয়ে আছে প্রশ্নটিতে। উত্তরটি কিন্তু তেমন সহজ নয়।

জাতীয় আয়ের কথা প্রথম ধরা যাক। অর্থনীতিবিদ মাত্রই বলবেন, জাতীয় আয়ের দুটি সংজ্ঞা—জি ডি পি বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এবং জি এন পি বা গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট। পরিস্থিতি অনুসারে জাতীয় আয় বা গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম বলতে কখনও আমরা জি ডি পি বুঝি, কখনও বুঝি জি এন পি। বছরে দেশের অভ্যন্তরে যে দ্রব্য (গুডস্) ও পরিষেবা (সার্ভিসেস) উৎপাদিত হচ্ছে, তার সমষ্টি হলো জি ডি পি। জাতীয় আয় কিন্তু অন্যান্য সূত্রেও আসতে পারে। যথা বিদেশে স্থিত ভারতীয় শ্রম (লেবার) বা পুঁজি (ক্যাপিটাল)। এসবের মজুরি হিসেবে যে আয় প্রবাহ ঘটবে, তা জি এন পি-তে পরিগণিত হবে, জি ডি পি-তে নয়। একই ভাবে বিয়োগ করা হবে ভারতে স্থিত বিদেশী পুঁজি বা শ্রমের মজুরি। ৯ শতাংশটি জি ডি পি বৃদ্ধির হার, জি এন পি নয়। অধিকাংশ সরকারী তথ্যই জি ডি পি-র ওপর নির্ভরশীল, কারণ আন্তর্জাতিক লেনদেনের আয়ে ঝট্ করে পাওয়া যায় না। বর্তমান আলোচনার জন্য জি ডি পি ও জি এন পি-র পার্থক্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দেশে ন্যানোও তৈরি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে মোবাইলও। জি ডি পি পরিগণনার জন্য এই দুটিকে তো আর জুড়ে দেওয়া যায় না! অথবা সরাসরি ভাবে জোড়া যায় না। এমনভাবে জুড়ে দেওয়ার আগে কোনো একটি সাধারণ মানদণ্ড ব্যবহার করতে হবে। অর্থনীতিবিদদের ব্যবহৃত এই সাধারণ মানদণ্ডটি হল দ্রব্যটির মূল্যমান। ন্যানোর মূল্য দিয়ে ন্যানোর উৎপাদনকে গুণ করা হবে। মোবাইলের মূল্য দিয়ে মোবাইলের উৎপাদনকে গুণ করা হবে। তার পরে করা হবে যোগ। মূল্য নির্ধারণ করার জন্য একটি মার্কেট (বাজার) দরকার। বাজার না থাকলে মূল্য কীভাবে জানা যাবে? অর্থাৎ জি ডি পি উৎপাদিত দ্রব্য ও পরিষেবার সমষ্টি নয়। শুধু তাই গণনা করা হয়, যার একটি বাজার দর আছে। মার্কেটেবল গুডস ও সার্ভিসেস-এর সমষ্টি হলো জি ডি পি। কোনো অর্থনীতিবিদ বলবেন না যে বিকাশের একমাত্র সূচক হল জি ডি পি। সূচক হিসেবে জি ডি পি-র সমালোচনা থাকতেই পারে। অনেক কিছুই জি ডি পি-র গণনায় ধরা পড়ে না। যথা পর্যাবরণের দূষণ অথবা ঘরের ভেতর গৃহিণীর কাজ। অথবা কয়েক ধরনের কালো টাকা। ধরা পড়ে না, কারণ এদের কোনো নির্ধারিত বাজার নেই। নেই কোনো মূল্য। সমালোচনাটি ঠিক। কিন্তু এই সমালোচনার ফলে আলোচনা বিশেষ এগোয় না।

পরবর্তী প্রশ্ন মূল্যমান বৃদ্ধি (ইনফ্লেশন) নিয়ে। এই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কখনো কখনো জনমানসে কিঞ্চিৎ ভুল ধারণা দেখা যায়। মূল্যমানের বৃদ্ধিকে বলে ইনফ্লেশন। ধরা যাক, সরকার বলল মুদ্রাস্ফীতির হার ৯ শতাংশ থেকে কমে ৭ শতাংশ হয়েছে। অনেকেই তখন বলেন—আমি তো তেমনটা দেখছি না। দ্রব্যের মূল্য তো বেড়েই চলেছে! সত্যি কথা। আগে দ্রব্যের মূল্য বাড়ছিল গড়ে ৯ শতাংশ হারে, এখন বাড়ছে ৭ শতাংশ হারে। মুদ্রাস্ফীতি ঋণাত্মক (নেগেটিভ) না হওয়া পর্যন্ত মূল্য কমার প্রশ্ন ওঠে না। এবং এই পরিস্থিতিকে বলা হয় ডিস-ইনফ্লেশন বা ডিফ্লেশন। আলাদা আলাদা দ্রব্যের মূল্যে পরিবর্তন আলাদা। তাই গড়ে কী ঘটছে, তা আন্দাজ করার জন্য একটি সূচক (ইনডেক্স) চাই। এই ইনডেক্স-এ কোন কোন দ্রব্য বা পরিষেবা থাকবে, তা প্রথম স্থির করতে হবে। তাদের দিতে হবে ভর বা ওয়েট। মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তার পরে গড় হিসাব করে সৃষ্ট হবে সূচক। আমাদের দেশে আছে মোটামুটি দু'ধরনের মূল্যবৃদ্ধির সূচক। প্রথমটিকে বলে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (সি পি আই), দ্বিতীয়টিকে বলে হোলসেল প্রাইস ইনডেক্স (ডব্লিউ পি আই)। হয়ত বা সি পি আই দেখাচ্ছে মূল্যমানে বৃদ্ধি ঘটছে ১০ শতাংশ হারে। অথচ আমি দেখছি সব্জির মূল্য বাড়ছে ২০ শতাংশ হারে। আমি যদি বলি, সরকারি তথ্যকে আমি বিশ্বাস করি না। এই কথাটি খুব যুক্তিসঙ্গত হল না। সরকারি তথ্যে আছে নানা সমস্যা। আমাদের দেশ উন্নত দেশ নয়। অনেক অর্থনৈতিক লেনদেন ঘটে আনঅর্গানাইজড বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে। মানিটাইজেশন কম, এ বছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় তার রূপরেখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ২০০১ সালে সঙ্কলিত হয়েছিল ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল

কমিশন-এর রিপোর্ট। তাতে এই ঘাটতিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। ঘাটতি থাকা এক জিনিস, স্বেচ্ছাকৃত ভাবে তথ্যে গরমিল আনা অন্য। অতি বড় নিন্দুকও বোধহয় বলবেন না যে ভারতীয় সরকার ইচ্ছে করে ভুল তথ্য সরবরাহ করে থাকে। সি পি আই বা ডব্লিউ পি আই সূচক দ্বারা আনা মুদ্রাস্ফীতি একটি গড় ধারার সঙ্কেত দিয়ে থাকে। আমার মূল্যায়নে আমি যে ভর (ওয়েট) ব্যবহার করছি, তার সঙ্গে গড় সূচকের সামঞ্জস্য নাও থাকতে পারে। কোনোটাই ভুল নয়।

তবু মূল্যমান বৃদ্ধি সম্পর্কে অন্য একটা প্রশ্ন এসে পড়ে। এখন পর্যন্ত দু'ধরনের সূচকের কথা বলেছি—ডব্লিউ পি আই এবং সি পি আই। ডব্লিউ পি আই অনেকটা পাইকারি গোছের (হোলসেল)। উৎপাদন ব্যবস্থায় ইনপুট-এর মূল্য কতটা বাড়ল, তাই ধরা পড়ে ডব্লিউ পি আই-এ। ঠিক তেমনি, সি পি আই খুচরো (রিটেল) গোছের। উপভোক্তার (কনজিউমার) দৃষ্টিতে সি পি আই বেশি প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও কিন্তু মূল্যমান বৃদ্ধির অন্য একটি সূচক আছে। তাকে বলা হয় জি ডি পি ডিফ্লেশন। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। বাজেটে বলা হয়েছে ২০১১-১২তে আপাত (নমিনাল) জাতীয় আয়বৃদ্ধি ঘটবে ১৪ শতাংশ হারে। মূল্যবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ। সুতরাং বাস্তবিক (রিয়েল) জি ডি পি বৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ। এই ৫ শতাংশ বৃদ্ধি হল জি ডি পি ডিফ্লেশন অনুযায়ী মূল্যবৃদ্ধির হার। ৯ শতাংশ বৃদ্ধির হার হলে গড়ে প্রত্যেকটি ভারতীয়ের আয় বাড়বে ৯ শতাংশ হারে। প্রশ্ন, গড় ভারতীয়ের ক্ষেত্রে কি মূল্যমান বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ, না তার চেয়ে বেশি। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যদি ১০ শতাংশ হারে বাড়তে থাকে, তাহলে হয়ত ঐ ৫ শতাংশ অঙ্কটা সত্যি নয়। অর্থাৎ গড় ভারতীয়ের বাস্তবিক আয় ৯ শতাংশ বাড়বে না। বাড়বে তার চেয়ে কম। বিশেষ করে যখন দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বেড়েছে। এ ধরনের পরিষেবা সরবরাহের সূত্র আগে জানা দরকার। এখন দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যেও এইসব পরিষেবার সূত্র ব্যক্তিগত (প্রাইভেট)। তাই পরিসেবার মূল্যও বেড়েছে।

অর্থাৎ গড় ভারতীয়ের বাস্তবিক আয় ৯ শতাংশ হারে বাড়ছে না। বৃদ্ধির হার তার চেয়ে কম। কিন্তু মূল্যমানে বৃদ্ধি এমনও নয় যে বাস্তবিক আয় একেবারেই বাড়ছে না। হয়ত বা বাড়ছে ৫ শতাংশ হারে। কিন্তু এ তো গড়ের (অ্যাভারেজ) কথা হল। আয়ের বণ্টন বা আয় বৃদ্ধির বণ্টন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয় আয়ের তথ্য আসে সি এস ও (সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অরগানাইজেশন) মারফত। বণ্টনের কোনো তথ্য কিন্তু সি এস ও সূত্রে পাওয়া যায় না। সি এস ও-র তথ্য একেবারেই সমষ্টিগত (অ্যাগ্রিগেট)। ব্যতিক্রম একটা। জাতীয় আয়ের কতটা প্রাথমিক (প্রাইমারি), দ্বিতীয় (সেকেন্ডারি) ও তৃতীয় ক্ষেত্র (tertiary) থেকে আসছে, তা জানায় সি এস ও। প্রাথমিক ক্ষেত্র বলতে মূলত কৃষিক্ষেত্র বুঝি। দ্বিতীয় ক্ষেত্র হল মূলত শিল্প (ইনডাস্ট্রি) এবং তৃতীয় ক্ষেত্র হল মূলত পরিষেবা (সার্ভিসেস)। জনসাধারণের কতজন কৃষিক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন, তা তর্কসাপেক্ষ। অনেক সময় ৫৫ শতাংশ সংখ্যাটা শোনা যায়। এই সংখ্যাটা একেবারে নির্ভুল নয়। ৫৫ শতাংশের মুখ্য জীবনধারণের ক্ষেত্র হলো কৃষি। কৃষি বর্ষানির্ভর হলে হয়ত বা ৩ মাস চাষ করা যায়। বাকি ৯ মাস জীবনধারণের উৎস অন্য। তবু ঐ ৫৫ শতাংশ অঙ্কটাই ধরা যাক। জাতীয় আয়ের কতটা কৃষি থেকে আসছে, তার পরিমাণ ক্রমশ কমছে। এখন ১৬ শতাংশ মতো। সুতরাং ৫৫ শতাংশ জনসাধারণ উৎপাদন করছেন ১৬ শতাংশ জাতীয় আয় এবং তা ক্রমশও কমছে। স্পষ্টতই বণ্টনে একটা সমস্যা আছে। আয়বৃদ্ধি ঘটছে শিল্প ও পরিষেবার দরুন, কৃষির হাঁড়ির হাল। কৃষিক্ষেত্রে আবার দুই বর্গের জনসাধারণ—জমির মালিক (ল্যান্ডহোল্ডার) ও কৃষিশ্রমিক (এগ্রিকালচারাল লেবারার)। কৃষি সমস্যাটা প্রধানত জমির মালিকের।

এই সেক্টোরাল অবদান ছাড়া সি এস ও মারফত এর চেয়ে বেশি কিছু আমরা জানতে পারব না। বণ্টন সম্বন্ধে জানতে চাইলে অন্য তথ্য চাই। এই তথ্য আসে ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে (এন এস এস) মারফত। এন এস এস-এর বড় বড় স্যাম্পল-এর তথ্য কিন্তু প্রতি বছর পাওয়া যায় না। পাঁচ বছর অন্তর অন্তর আসে এই তথ্য। এখনও ২০০৪-০৫ সালের তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বছর ২০০৯-১০ সালের তথ্য পাওয়া যাবে। এন এস এস সংগৃহীত তথ্য উপভোক্তা ব্যয়ের (কনজাম্পশন এক্সপেনডিচার), আয়ের নয়। আয়ের বণ্টন সম্বন্ধে ভারতে তথ্য নেই। এন সি এ ই আর (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ) নামক একটি সংস্থা আয়ের তথ্য সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু তা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। দারিদ্র্য ও বৈষম্য (ইনইক্যুইয়্যালিটি) নিয়ে যা তথ্য, তা এখনও ঐ ২০০৪-০৫-এর এন এস এস-এর ভিত্তিতে। মনে রাখতে হবে, ভারতে বর্ধিত হারে আয়বৃদ্ধি ঘটেছে ২০০৩ ও ২০০৭-এর মধ্যে। সেই বৃদ্ধির পুরোটা ২০০৪-০৫-এর পরিসংখ্যানে ধরা পড়বে না।

প্রথম প্রশ্ন, দেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে কি না? এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার জন্য একটা দারিদ্র্য রেখা গঠন করা প্রয়োজন। অন্তত তিনটি আলাদা আলাদা দারিদ্র্যের হার (পভার্টি রেশিও) আছে, যার প্রত্যেকটিরই সূত্র ঐ ২০০৪-০৫ সালের এন এস এস। প্রথমটি যোজনা কমিশনের চিরাচরিত দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে। তাতে দেখা যাচ্ছে সর্বভারতীয় স্তরে দারিদ্র্যের হার ২৬.৫ শতাংশ। দ্বিতীয়টি শুধুমাত্র গ্রামীণ ভারতের জন্য, তাতে দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্যের হার ৩৭ শতাংশ। তৃতীয়টি ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর মারফত। এবং এতে দেখা যাচ্ছে, দারিদ্র্যের হার ৭৭ শতাংশ, কারণ

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করা হয়েছে—যোজনা কমিশনের অভ্যন্তরীণ দারিদ্র্য রেখা নয়। এছাড়া মিনিস্ট্রি অভ রুরাল ডেভেলপমেন্ট একটি সমীক্ষা (সার্ভে) করে দেখেছে যে গ্রামীণ ভারতে দারিদ্র্যের হার ৫০ শতাংশ। এই তথ্য ও তর্কের কচকচিতে মূল প্রশ্নগুলো ভুলে যাওয়া সহজ। দেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে, তা অনস্বীকার্য। এই হ্রাস মোটামুটি শুরু হয়েছে ৮০-র দশকে, কারণ আয়বৃদ্ধির হার দ্রুততর হয়েছে ৮০-র দশক থেকে। ১৯৫০-এর কাছাকাছি দারিদ্র্যের হার ছিল ৫০ শতাংশ, ১৯৮০-র কাছাকাছিও ৫০ শতাংশ। হারটা যে কমেছে, তা অনস্বীকার্য। তবে সঙ্গত কারণেই বলা যায়, ২৬.৫ শতাংশ বা ৭৭ শতাংশ অত্যধিক। আরো কম হওয়া দরকার। একথাও সঙ্গত কারণেই বলা যায় যে সর্বভারতীয় স্তরে হ্রাস ঘটলেও, দেশের সর্বত্র সম পরিমাণে হ্রাস ঘটেনি। গ্রামীণ ভারতের কথা আগেই বলেছি, এছাড়া মধ্য ভারত, পূর্ব ভারত ও উত্তর পূর্ব ভারতে তেমন হ্রাস ঘটেনি। সুতরাং দারিদ্র্য কমলেও, সেই সাফল্য অবিমিশ্র নয়। এছাড়া ব্যবহৃত দারিদ্র্য রেখা মূলত খাদ্য (ফুড) ভিত্তিক, যৎসামান্য কাপড় (গারমেন্টস) যোগ করা হয় তাতে। আগেই বলেছি, দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) ব্যয় বৃদ্ধি বেড়েছে। এ ধরনের ব্যয় দারিদ্র্যরেখায় ধরা হয় না। তাই বলতেই পারি, সরকারি পরিসংখ্যানে দারিদ্র্যের পরিমাপটা লঘু করে দেখা হচ্ছে। জনসাধারণের সর্বনিম্ন ১০ শতাংশের (decile) কথা ধরা যাক। ৮০-র দশক থেকে শুরু করে তাঁরা কিনেছেন মোবাইল, ফ্যান, বাইসাইকেল। কাঠের বদলে ব্যবহার করছেন রান্নার গ্যাস। এগুলো কাম্য পরিবর্তন। অগ্রাহ্য করা যায় না।

আবার ঐ জি ডি পি-র প্রশ্নে ফিরে যাই। জি ডি পি বা তার উদ্দেশ্য (end) নয়, উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি একটি সোপান (means) মাত্র। সেইজন্যই জি ডি পিকে মানব বিকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য বা সূচক বলে মানা হয় না। মানব বিকাশের (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট) অন্যান্য সূচক আছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে হিউম্যান ডেপেলপমেন্ট ইনডেক্স (এইচ ডি আই)। এইচ ডি আই তিনটি পরিবর্তনশীল বিষয়ের (ভ্যারিয়েবল) ওপর নির্ভর করে—মাথাপিছু আয় (পার ক্যাপিটা ইনকাম), স্বাস্থ্য (হেল্‌থ) ও শিক্ষা। ৯০-এর দশক থেকে এইচ ডি আই-তে উন্নতিও প্রতিষ্ঠিত সত্য। তবে কিনা এইচ ডি আই-এ উন্নতি প্রধানত এসেছে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির ফলে। স্কুলে ভর্তি (গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও) ছাড়া শিক্ষার সূচকে তেমন মারাত্মক উন্নতি ঘটেনি। এবং স্বাস্থ্যের সূচকে উন্নতি আরো কম। এছাড়া যেমনটা আগে বলেছি—মধ্য ভারতে, পূর্ব ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতে উন্নতি এখনও সীমিত।

বৈষম্যের (ইনইক্যুয়্যালটি) প্রশ্ন এসেই গড়ে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের ধারণা সংস্কার পরবর্তী ভারতে বৈষম্য অসম্ভব বেড়ে গেছে। অর্থাৎ আয়ের বণ্টনে বৈষম্যের কথা বলছি। আমরা আয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করি না। এবং আয়ের বণ্টনে বৈষম্য উপভোক্তা ব্যয়ের বণ্টন বৈষম্যের চেয়ে বেশি হওয়ারই কথা। এছাড়া ব্যয়ের বণ্টনে বৈষম্যের পরিসংখ্যান ২০০৪-০৫ সালের। তাতে কিন্তু বৈষম্য মারাত্মকভাবে বেড়ে ওঠার কোনো চিহ্ন পরিস্ফুট নয়। তবে পারসেপশনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, ফ্যাক্টস যাই হোক না কেন। যেসব দেশে দ্রুতগতিতে আয়বৃদ্ধি ঘটেছে, প্রত্যেকটি দেশেই বৈষম্য বেড়েছে। চীন তার নিদর্শন। সুতরাং ভারতেও বৈষম্য বেড়ে থাকলে তা অস্বাভাবিক নয়।

বর্তমান সরকারের স্লোগান হচ্ছে ইনক্লুসিভ গ্রোথ। এই স্লোগানের অর্থ কী? প্রত্যেকটি নাগরিকই চেয়ে থাকেন যে তাঁর জীবনযাত্রার মানে উন্নতি আসবে। আসবে আয়বৃদ্ধির সুযোগ। আগামী প্রজন্মের জন্য পাওয়া যাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। থাকবে আইন শৃঙ্খলা। বাজার প্রসূত সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য কয়েকটি জিনিস চাই—রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, সেচের জল, প্রাথমিক স্কুল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দক্ষতা (স্কিলস), কারিগরি (টেকনোলজি), বাজার সম্বন্ধে তথ্য (ইনফরমেশন), ঋণ জোগান, বিমা, জমি এবং আইন-শৃঙ্খলা। এ ধরনের অনেক ক্ষেত্রেই থাকে বাজারের পতন। এটি অর্থনীতিবিদদের ব্যবহার করা একটা সংজ্ঞা। তাৎপর্য হল যে এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সরবরাহ (প্রাইভেট প্রভিশনিং) সম্ভব নয়। এই ধরনের পরিষেবা সরবরাহ করতে হবে সরকারকে। তিন স্তরের সরকার—কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয়—এই বাবদে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে, বিশেষ করে প্রথম দুটি স্তরের সরকার।

সরকারি ব্যয়ের জন্য অর্থ চাই। জি ডি পি বৃদ্ধির ফলে সরকারের হাতেও আছে ব্যয় করার ক্ষমতা। বিলগ্নীকরণ বা স্পেকট্রাম বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থের কথা থাক। মূল্য প্রবাহ আসে করব্যবস্থা মারফত। বর্তমানে জি ডি পি-এর হার হিসেবে কর হচ্ছে ১৭ শতাংশ। কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের কর একত্রিত করে। দুই স্তরের ব্যয় একত্রিত করলে সরকারি ব্যয় দাঁড়ায় জি ডি পি-র ২৫ শতাংশ। এই বাড়তি ৮ শতাংশ কোথা থেকে আসছে? উত্তরটা জটিল। তবে সাধারণ ভাষায় দুই স্তরের সরকারই দিচ্ছে ঋণ। তাতে বাড়ছে সুদের হার ও মূল্যমানে (ইনফ্লেশন) বৃদ্ধি। কোনোটাই কাম্য নয়। কারণ এই মাশুল বহন করতে হয় জনসাধারণকে, এমনকি দরিদ্র জনতার ওপর ভারটা বেশি হারে পড়ে। অথচ বাজেট ডকুমেন্ট আমাদের জানায় যে যাবতীয় কর ছাড়ের অবসান ঘটলে কর বাবদ জি ডি পি-তে আরো ৫ শতাংশ পাওয়া যাবে । এই কর ছাড়ের ফলে কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের কিছুমাত্র লাভ নেই। তাই এই কর ছাড়ের অন্ত চাই। যার ফলে স্বচ্ছন্দে জি ডি পি-র বাড়তি ৫ শতাংশ ব্যয় করা যাবে বস্তুগত ও সামাজিক পরিকাঠামোর জন্য।

কিন্তু এতে তো শুধু সরকারি আমদানির কথা বলা হল। সরকার প্রচুর ব্যয় করে থাকে এখনো। কিন্তু সেই ব্যয় অকুশল (ইনএফিশিয়েন্ট)। দরিদ্রের হাতে সেই ব্যয়ের লাভ পৌঁছোয় না। দুর্নীতি ছাড়া আছে অত্যধিক প্রশাসনিক ব্যয় (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টস)। বিকেন্দ্রীকরণের নামাবলী সব সরকারের গলাতেই। কিন্তু প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ কোনো সরকারই করতে চায় না। সেজন্যই সরকারকে বিজাতীয় (alien) বলে মনে হয়। এই বিজাতীয় সরকার উৎপীড়ন করে থাকে জমি (ল্যান্ড), অরণ্য (ফরেস্টস) ও আবগারি ইনস্পেক্টর-এর মারফত। দিতে পারে না আইনশৃঙ্খলা। তাই বিকাশ বলতে যা বোঝানো হয়, সেই বিকাশ সম্বন্ধে দেশের অনেক অংশেই জনসাধারণের বিরাগ, বিরোধ ও প্রতিরোধ। বিকাশের উদ্দেশ্য যে মানুষ, তা ভুললে কী করে চলবে!

উমা

ভিক্ষাপত্র

দিবস দাস

বাবা, একটা ভোট দে
আমি তোকে আজীবন নিরক্ষর করে রেখে দোব
বাবা, একটা ভোট দে
আমি তোকে কাটা তেল, আর্সিনিক, ফ্লাই-অ্যাশ দোব
আমি তোর হাড়-ছ্যাঁচা পয়সায় জুড়ি-গাড়ি, প্রাসাদ
বানাব
ভুয়ো সিম কার্ড দোব, বন্যা-খরা দোব
রিলিফের টাকা মেরে আকাশ থেকে দেখতে যাব
তোরা যে কি কষ্টেই আছিস
বিধানসভা বয়কট করব, লোকসভায় চেয়ার ছুঁড়ব
খিস্তি হবে, হাতাহাতি হবে
হবেই—
বাবা দেখে নিস
রাস্তা জুড়ে খানা-খন্দ পড়েই থাকবে
ট্রেনে-প্লেনে দুর্ঘটনা লেগেই থাকবে
আর, দুর্ঘটনা হলেই ক্ষতিপূরণ;
তোদেরই তো টাকা, অসুবিধে কি?
নিশ্চিন্তে মরার মত হাসপাতালে বেড দোব
বেড না পেলে মেঝে দোব—হ্যাঁ রে বাবা—
মিলিয়ে নিস।
বাবা, একটা ভোট দে
আমি তোকে আদিগন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে
কাল থেকে পাঁচবছর চিনতেও পারব না
অঢেল পাথর পুঁতে দোব
সুইজারল্যান্ড বানিয়ে দোব
পুকুরগুলো বুজিয়ে দোব
সন্ধেবেলায় সেজেগুজে বৈদ্যুতিন চ্যানেলে:-.
ঝগড়া করব
কাদের কত খুন হয়েছে, নিখুঁত হিসেব দিয়ে দোব
কালোটাকার কারবারিদের জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে নোব
মারাদোনাকে খেলিয়ে দোব
উগ্রপন্থী লেলিয়ে দোব
প্রোমোটারের বিয়ে দোব
বটানিক্যাল বাগান জুড়ে নেমন্তন্ন খাইয়ে দোব
বাবা, একটা ভোট দে—একটাই তো ভোট
আমি তোকে খেতে না দিয়ে, পরতে না দিয়ে
অমানুষ করে তোলার সমস্ত প্রকরণ জানি
দুর্নীতি, ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি
—এসব আমার এক হাতের খেলা
বলতে গেলে,
গোটা পৃথিবীটাই আমার হাতের মুঠোয়
কিন্তু কি আশ্চর্য দ্যাখ
আমি বাঁধা পড়ে গেছি
তোর মত মূর্খের আঙ্গুলের ডগে...
—দিয়েই দে না, বাপ,
পয়সা তো লাগছে না!

উমা

এখনো গেল না আঁধার

শ্যামল চক্রবর্তী

নীলরতন সরকার (১.১০.১৮৬১-১৮.৫.১৯৪৩) জন্মেছিলেন দঃ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার সংলগ্ন নেত্রা গ্রামে। শৈশবে ও ছাত্রাবস্থায় দারিদ্রের সঙ্গে কঠিন লড়াই করে নীলরতন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন 'ধন্বন্তরী' এক চিকিৎসক হিসেবে। আর্ত পীড়িত দরিদ্র মানুষকে সুস্থ করে তোলা ছিল যেন মহান এই বঙ্গসন্তানের ব্রত। এ বছর তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে এই বিশেষ নিবন্ধ।

তাঁর শিল্পের পরম সৌন্দর্য, কাব্যের অনন্য হৃদয়গ্রাহীতা, সারা বিশ্বের জন্য তাঁর ভালবাসার গভীর উদ্ভাস, তাঁর দৃষ্টির অসীম ব্যাপ্তি, ধর্মবোধের গভীরতা ও উদার সমর্পণ—এর সবকটিকে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। সবিনয়ে বলি, এর জন্য আমি বিশেষভাবে গর্বিত।' রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মদিনে কবির এরকম মূল্যায়ন কোনও সাহিত্যসেবীর নয়, রবীন্দ্রবান্ধব এক বিশিষ্ট চিকিৎসকের। চিকিৎসকের নাম ডাঃ নীলরতন সরকার। শুধু চিকিৎসক নন তিনি, একইসঙ্গে বড়মাপের এক দেশপ্রেমিক ও শিক্ষাসংস্কারক বিশাল হৃদয়ের এক বাঙালি।

কেমন চিকিৎসক তিনি? যাঁর প্রশান্ত মুখ আর স্মিত হাসি দেখলেই অর্ধেক রোগ সেরে যায় রোগপীড়িত মানুষের। চিকিৎসার জন্য রোগীকে পরীক্ষা করার সময় যাঁর খেয়াল থাকে না, রোগী ধনী, না নির্ধন। ওষুধ দেন সামান্য, সঙ্গে পথ্যের সবিস্তার পরামর্শ। রোগীর আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে যিনি ফি নেবার ব্যাপারটা এড়িয়ে যান আশ্চর্য দক্ষতায়। প্রয়োজনে রোগীকে তাঁর আত্মীয়স্বজনসহ আশ্রয় দেন নিজের বাড়িতে। দায়িত্ব নেন ওষুধের, পথ্যের। রোগ সংক্রামক হলেও যিনি ভয় পান না প্রয়োজনে রোগীকে নিজগৃহে আশ্রয় দিতে।

অথচ এমন নয় যে চিকিৎসায় রোগ সারানো তাঁর নেশা। চিকিৎসা করাই ডাক্তারটির পেশা। কলকাতার প্রায় সব ধনীই তাঁর রোগী। রোগী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশজোড়া। শুধু দেশে নয়, তাঁর চিকিৎসক হিসেবে প্রতিভার সুখ্যাতি ছড়িয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকাতেও। সারা দেশ থেকে মুমূর্ষু, মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে 'শেষ ভরসা' হিসেবে নিয়ে আসা হয় তাঁর কাছে। তিনি একবার রোগীকে দেখলেই যেন পিছু হটবে মৃত্যু। অনেকসময় হয়ও তাই। এত খ্যাতি ডাক্তার নীলরতনের, তবু এতটুকু আত্মতুষ্টির ছাপ নেই তাঁর মুখেচোখে। যেন নিজের কর্তব্যটুকু করে চলেছেন প্রশান্ত মনে।

নীলরতনের বয়স তখন মাত্র তিন। এক আশ্বিনের ঝড়ে ভেঙে পড়ল নন্দলাল সরকারের নেত্রা গ্রামের বাড়ি, প্লাবিত হল জলোচ্ছ্বাসে। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে নন্দলালকে আশ্রয় নিতে হল জয়নগরে, শ্বশুরালয়ে। দরিদ্র নন্দলালের দ্বিতীয় সন্তান নীলরতন। জয়নগরের আশেপাশে তখন বেশ কিছু মুক্তচিন্তার মানুষের, উদার ব্রাহ্মের বসবাস। উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরনাথ বসু বা দীননাথ দত্ত যেমন। এঁদের সংস্পর্শে বড় হতে হতে নীলরতনের চরিত্রে বাল্যকালেই দেখা দিল প্রবল জিজ্ঞাসা, প্রখর জ্ঞানপিপাসা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকেই শিশু নীলরতন আলোর পথযাত্রী।

আর্থিক অনটন তীব্র, দারিদ্র্য প্রবলতর। আটটি সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে শরীর ভাঙলো নীলরতন জননী থাকোমণির। নীলরতনের বয়স তখন মাত্র চোদ্দ। জীর্ণ, ক্লিষ্ট জননী রোগযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন শেষশয্যায়, চিকিৎসক ডাকার পয়সাটুকুও নেই পিতার হাতে। মৃত্যুপথযাত্রী মাকে ছুঁয়ে চিৎকার করে কাঁদছে সাতসাতটি ছেলেমেয়ে। জল নেই শুধু নীলরতনের চোখে। বুকের মধ্যে ঝড়, প্রতিটি অশ্রুকণা ইস্পাতকঠিন সঙ্কল্প হয়ে জমছে বালকের হৃদয়ে। 'বড় ডাক্তার' তাকে হতেই হবে। শুধু বড় ডাক্তার নয়, বড় মানুষ। যে মানুষটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করবে মৃত্যুর সঙ্গে। হাসি ফোটাবে আর্ত পীড়িত নির্ধনের ক্লিষ্ট মুখে। রোগযন্ত্রণার সঙ্গে টক্কর দেবে জ্ঞানের অস্ত্রে, বিজ্ঞানের আলোয়।

১৮৭৬-এ জয়নগরের স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করে কলকাতায় এলেন নীলরতন। অর্থাভাবে ভর্তি হতে পারেন নি মেডিকেল কলেজে। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়ে ১৮৭৯-তে এল এম এফ পাশ। তীব্র অর্থসঙ্কট কাটাতে তারপর স্কুল শিক্ষকের চাকরি, পরীক্ষায় নজরদারির কাজ, লোকগণনার কাজ—কী করেন নি তিনি! কাজ করতে করতেই

১৮৮৩ সালে আই এ ও ১৮৮৫-তে বি এ পাশ। ক্যাম্বেলে পড়তে পড়তেই অধ্যক্ষ ডাক্তার ম্যাকেঞ্জির সুনজরে পড়েন। তাঁরই সুপারিশে মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক পাঠক্রমে ভর্তি, সরাসরি তৃতীয় বর্ষে। ১৮৮৮ সালে পাশ করলেন এম বি। ১৮৮৯-তে একসঙ্গে এম এ ও এম ডি। এম বি পাশ করে কাজ করছিলেন মেয়ো হাসপাতালে। ১৮৯০-তে চাকরি ছেড়ে শুরু করলেন স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই কলকাতার বুকে ছড়িয়ে পড়েছে নীলরতনের ডাক্তারি সুনাম। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সারা ভারত চিনেছে নীলরতনকে, দেশ পেরিয়ে খ্যাতি ছড়িয়েছে বিদেশে। তবু এতটুকু উন্নাসিকতা ছুঁতে পারে নি তাঁকে। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে রোগ সারিয়েছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে। অনেকসময় ভুলে গেছেন ঘুমোতে, আহার সারতে। রোগের দিকে তীব্র সজাগ দৃষ্টি, রোগীর প্রতি বুকভরা ভালবাসা, অপার সহানুভূতি। নীলরতন রোগীর ঘরে ঢুকলেই যে অর্ধেক ভালো হয়ে উঠবেন রোগী তার রসায়নে ডাক্তারি প্রতিভা আর মানবপ্রেমের আশ্চর্য সংশ্লেষ।

ডাক্তার হিসেবে শুধু নয়, মানুষ হিসেবে 'তাঁহার স্বভাব-চরিত্রের যে উদারতা, আত্মনিবেদন ও স্নিগ্ধ মিষ্ট ব্যবহার পরের জীবনে খ্যাত হয় সে সবই তাঁহার... স্নেহমমতাময়ী মায়ের অবদান।' লিখছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র পরবর্তীকালের প্রবাসী-সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আলোর পথযাত্রী তিনি। থামলে চলবে না তাঁকে। পরাধীন দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে শিক্ষার আলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো। ১৮৯৩ থেকেই নীলরতন যুক্ত হয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের কাজে। তাঁর চেষ্টায় বিজ্ঞান ও কলার পাঠ্যক্রম সুবিন্যস্ত ও আলাদা হয়েছে। শুরু হয়েছে মাতৃভাষায় পঠনপাঠনের চেষ্টা। ১৯১৯ থেকে দু'বছরের জন্য উপাচার্য হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের। এরপরও ১৯৩৯ পর্যন্ত নানা দায়িত্ব সামলেছেন ঐতিহ্যবান ঐ প্রতিষ্ঠানের। বহুবার রুখে দাঁড়িয়েছেন ইংরেজ শাসকদের শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে। লড়াই করেছেন সামনাসামনি। বেশিরভাগ সময় রদ হয়েছে সেইসব অন্যায় আদেশ।

পীড়িত, রোগজর্জর মানুষের চিকিৎসায় শুধু একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়, বুঝেছেন তিনি। তাই ইংরেজ শাসকদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চেয়েছেন একটি স্বদেশি চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। আর্জি নিয়ে হাজির হয়েছেন তখনকার বাংলার বড়লাট লর্ড কার্মাইকেলের দরবারে। ধূর্ত কার্মাইকেল অল্পদিনের সময়সীমায় বিপুল অর্থ তুলে দিতে বললেন নীলরতনকে। ব্রিটিশসিংহের কাছে হার মানতে শেখেন নি ডাক্তার নীলরতন সরকার। টাকাটা তুলতেই হবে তাঁকে! গড়তে হবে স্বদেশি মেডিক্যাল কলেজ! নিজের সারাদিনের রোজগার জড়ো করলেন। সন্ধ্যার পর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রোজ হাজির হলেন ধনী রোগীদের বাড়ি বাড়ি। এতেও বাকি রইল অনেক টাকা। চিঠি লিখলেন বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে। ঠাকুরবাড়ির সক্রিয়তায় জোগাড় হল কিছু। তাতেও পাত্র পূর্ণ হল না। শেষ পর্যন্ত নিজের সবটুকু সঞ্চয় উপুড় করে সময়সীমার শেষদিন বিকেলে হাজির হলেন বড়লাটের অফিসকক্ষে।

বিস্ময়ে থ' বনে গেছেন লালমুখো কার্মাইকেল। তখন আর উপায় নেই! টাকা পেয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে রুখে দাঁড়াবেন নীলরতন। ১৯১৫-১৬ সালে বেলগাছিয়া মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠা করলেন কার্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেল স্বদেশি এই কলেজ। ১৯১৬ সাল থেকে শুরু হল পাঁচ বছরের ডাক্তারি পাঠক্রমে পড়াশোনা। আমৃত্যু এই কলেজের উন্নতিতে সক্রিয় থেকেছেন নীলরতন, নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছেন স্বদেশি এই প্রতিষ্ঠানকে। এই প্রতিষ্ঠানই আজ মহীরুহ, আজকের আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ।

সারা জীবন বারবার গ্যোয়েটের একটি আপ্তবাক্য আওড়াতেন নীলরতন। 'Light! More Light!' আলো, আরও আলো যুক্তিবুদ্ধির আলো, মেধা-মননের আলো। এই আলোর অন্বেষণে আজীবন সক্রিয় থেকেছেন নীলরতন। আলো ছড়িয়েছেন পরাধীনতার অন্ধকারে ডুবে থাকা ভারতের বুকে। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন যুক্তিবুদ্ধি, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স'। সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেন নীলরতন।

'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার দিন থেকে নীলরতন 'বিশ্বভারতী'র আজীবন ট্রাস্টি ও অন্যতম 'প্রধান'। জগদীশচন্দ্রের 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর কর্মসমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদেও তিনি। 'বিশ্বভারতী'কে বিশ্বমানের শিক্ষার মুক্তাঙ্গনে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবিতকালে পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই সফল হয়েছিল রবি ঠাকুরের স্বপ্ন। তার পেছনে নীলরতনের নীরব অবদান অনেক। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর বিজ্ঞান-গবেষণার অগ্রগতিতেও তাঁর সক্রিয়তা সাহায্য করেছে নানাভাবে।

স্বাদেশিকতার মন্ত্র বুকের গভীরে জায়গা পেয়েছিল নীলরতনের। স্বাদেশিকতার বোধে উদ্বুদ্ধ ছাত্ররা একসময় ব্রিটিশ কলেজ ছেড়ে দাবি করে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। যে দেশনেতারা সেদিন জাতীয় শিক্ষাশালা তৈরির জন্য গড়ে তুললেন 'জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ' ও 'জাতীয় কারিগরী শিক্ষা সংসদ', নীলরতন তাঁদের অন্যতম। নানা বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে এগোতে থাকে এই দুই প্রতিষ্ঠানের কাজ। কারিগরী শিক্ষার প্রসারে নীলরতনের সক্রিয়তায়, শ্রমে, অধ্যবসায়ে গড়ে উঠল 'বেঙ্গল টেকনিকাল ইনসটিটিউট'। কলকাতার প্রখ্যাত ধনী তারকনাথ পালিত তাঁর

সার্কুলার রোডের বিরাট জমিবাড়ি নীলরতনকে দান করলেন এই কারিগরি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। নীলরতন একাই কাঁধে তুলে নিলেন প্রতিষ্ঠানের সব ভার। কলেজ চলছে, পড়ছে ছাত্ররাও, অথচ কোনও আয় নেই কলেজের! 'তখনকার ছাত্রদের কাছে শোনা যায় ... একমাত্র আয় ছিল সকাল হইতে বেলা একটা পর্যন্ত ডাক্তার সরকারের সমস্ত উপার্জন।' উপার্জন বলতে রোগী দেখার ফি।

সেই প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত চলে যায় যাদবপুরে। এটিই আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ভারতের কারিগরি শিক্ষার পত্তনে প্রথম সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে মানুষটা, তিনি প্রযুক্তিবিদ নন, একজন চিকিৎসক। বিস্ময়কর, তবু এটাই বাস্তব। আজকের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা অবশ্য এ তথ্য জানেন না। ইতিহাসবিস্মৃত জাতি আমরা! ইতিহাসে আমাদের অনীহা চিরকালই ছিল, বাজারসংস্কৃতির এই যুগে বিস্মৃতি প্রবলতর।

শিক্ষা বিস্তারে নীলরতনের আজীবন সক্রিয় উদ্যোগ অবশ্য তাঁর অন্যান্য দায়দায়িত্বে এতটুকু অবহেলার বিনিময়ে হয় নি। এক বৃহৎ পরিবারের কর্তা নীলরতন। পরিবার বলতে পাঁচ কন্যা, এক পুত্র, স্ত্রী, নাতিনাতনিদের পরিবার। যে পরিবারের সীমা বলতে কিছু নেই। ভাগ্নে প্রশান্তচন্দ্র, ভাগ্নি সুরীতি, বোন,দিদি আছেনই, সে পরিবারে যখন তখন ঢুকে পড়ে গ্রাম থেকে পড়তে আসা দরিদ্র ছাত্র, মরণাপন্ন রোগী ও তাঁর সঙ্গী স্বজন।

দার্জিলিংয়ে তাঁর বাড়ি তো রীতিমত এক অতিথিশালা! কে যান না সেখানে। রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, রামানন্দ কন্যা সীতা দেবী, শান্তা দেবী তো অবশ্যই আছেন। শৈলশহরে বেড়াতে আসা হোটেলে ঠাঁই না-মেলা অপরিচিত মানুষেরও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয় সেখানে। এমনও হয়েছে যে পরিচিত অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড়ে নিজের বিছানাতেও অন্যের শয্যা, গৃহকর্তা 'নীলরতন ঘরের এক কোণে শুয়ে আছেন ক্যাম্প খাট বিছিয়ে'!

আজকের আত্মমগ্ন গড় বাঙালির চিত্রকল্পে নীলরতন সরকার তাই বড্ড বেমানান। ডাক্তার, বিশাল ডাক্তার, অথচ টান নেই টাকা পয়সার দিকে। স্যুট-টাই পরেন বটে, তবে ভেতরে পুরোদস্তুর স্বদেশি! কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ বসান না, তবে ইংরেজিটা লেখেন আর বলেন একদম ইংরেজদের মতো করে। নিজের আহার-নিদ্রা-বিলাস-ব্যসনে উদাসীন, যত চিন্তা চারপাশের মানুষের সুখসুবিধার দিকে।

অথচ এখানেই তিনি অনন্য। 'লাভ করিব এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়, কল্যাণ করিব এ লক্ষ্য করিয়াও...', 'ভারতবর্ষ'-তে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে ১৬ টাকা ফি দিয়ে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ৩২ টাকা হয়ে নীলরতনের ফি বেড়ে হয়েছিল ৬৪ টাকা। শুধু উন্নাসিক ইংরেজ ডাক্তারদের টক্কর দিতে এত টাকা নিতেন নীলরতন। নিতেন কাদের কাছ থেকে? ধনী রোগীদের। গরীব বা নিম্নবিত্ত কোনও মানুষ কোনওদিন ফি-এর অভাবে ফেরেন নি ডাক্তার নীলরতনের চেম্বার থেকে।

সারা জীবন প্রচুর অর্থোপার্জন করেছেন যশস্বী নীলরতন। চাইলেই পারতেন প্রচুর ভূসম্পত্তি, ধনরত্নের মালিক হতে। তিন চার প্রজন্মের শুয়েবসে দিনযাপনের ব্যবস্থা করে যেতে। তাহলে আর তিনি নীলরতন সরকার কেন! লাভ নয়, বিত্তবৃদ্ধি নয়, দেশের কল্যাণ, দশের মঙ্গলে অর্থোপার্জন তার লক্ষ্য। এই টাকায় চলবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ঘাটতি। শিল্পবিমুখ বাঙালিকে ধনে-বিত্তে বিদেশিদের সমকক্ষ হতে শেখাতে হবে শিল্পস্থাপনের পথ।

বাঙালিকে শিল্পমুখী করে তুলতে একের পর এক ব্যবসায় ঢেলেছেন অজস্র টাকা। চা-বাগান কিনেছেন, বিনিয়োগ করেছেন ট্যানারি শিল্পে, বানিয়েছেন দেশি 'বিজয়া সাবান'-এর কারখানা। মদত জুগিয়েছেন বন্ধু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বপ্নের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এও। এই প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানেরও পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন নীলরতন সরকার।

লাভ লোকসানের হিসেব করতে শেখেন নি নীলরতন সরকার। তাই এসব হিসেব করাকে 'সময় নষ্ট' বলে মনে করতেন। বাঙালিকে শিল্পের পথ চেনাতে টাকা ঢেলেছেন বিস্তর। হিসেব করেন নি লাভের। কেননা যাদের মাধ্যমে খরচ হয়েছে সেই টাকা, তারা যে গড়-বাঙালি! লাভের গুড় খেয়েছে পিপীলিকার দল! লোকসানের বোঝা চেপেছে শান্ত-নম্র-অবিচলিত নীলরতনের বলিষ্ঠ কাঁধে। একের পর এক সম্পদ বিক্রি করে ঋণের দায় মেটে নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের বসতবাড়িটি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেছে।

তবু অবিচলিত নীলরতন। সঙ্কটের মুখোমুখি তিনি আরও শান্ত, আরও স্থিত। কেউ ব্যবসার লোকসানে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নানা মানুষের দায় নিয়ে আলোচনা শুরু করলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। বলছেন, 'এ নিয়ে আলোচনা করে কী লাভ!' বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দেনার দায়ে। বিচলিত সবাই। একা নিষ্কম্প নীলরতন। 'এখনও কলকাতা শহরে কুড়ি পঁচিশ টাকার বাসা ভাড়া পাওয়া যায়। আমার ওতেই চলে যাবে।'

এই মানুষটাকে মাপা যাবে কোন নিক্তিতে! কীভাবে বোঝা যাবে গড়-বাঙালির মানদণ্ডে এই ব্যতিক্রমী বঙ্গসন্তানের জায়গাটিকে! সারা জীবন তমসার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেলেন এই যে মানুষটা, তাঁর মূল্যায়ন সহজ নয়। অন্তত আজকের এই বিত্ত-সংস্কৃতির, আত্মকেন্দ্রিকতার, হিংসা দ্বেষে ছেয়ে যাওয়া পরশ্রীকাতর বিপন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে।

চিকিৎসকদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ডাক্তার নীলরতন। মানুষের স্বার্থে, চিকিৎসকদের স্বার্থে। ১৯২৮ সালে

কলকাতায় অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে আই এম এ (ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন) তৈরি হয় তাঁরই উদ্যোগে। তাঁর সক্রিয়তায় ১৯২৩-এ জন্ম নেয় কলকাতা মেডিক্যাল ক্লাব। দীর্ঘকাল সম্পাদনা করেছেন আই এম এ-র বিখ্যাত জার্নালটি। তাঁর সম্পাদনায় ঐ পত্রিকা সারা ভারতের সব শ্রেণীর চিকিৎসকদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

নীলরতন ধনী, ঐশ্বর্যবান। শুধু অর্থে-বিত্তে-সম্পদে নয় অন্তরের ঐশ্বর্যে তিনি 'বড় মানুষ'। 'বড় মানুষ না হইতে পারিলে, বড় ডাক্তার হওয়া যায় না'। রবি ঠাকুরের এই কথাগুলো যে নীলরতনের অতিলৌকিক দৃষ্টান্তকে মনে করিয়ে দেয় নয় দশক পার করেও। বিত্তের-ঐশ্বর্যের ক্রোড়লালিত ক্লাব-লাঞ্চ আর পার্টির ডিনারে স্থিত, ক্লাব-সোসাইটি-কর্পোরেটের মৌতাতে মগ্ন আজকের 'বড় ডাক্তারবাবু'রা তো গণ-পরিসর হারিয়েছেন সেই কবে। ভরসা একটাই, বেশিরভাগ ডাক্তাররা আজও 'বড় ডাক্তার' নন। যে কোনও মূল্যে আজও ক্রীতদাস বনতে রাজি হন না বেশিরভাগ চিকিৎসক।

এইসব চিকিৎসকের কাছে আজও নীলরতন হয়ে উঠতে পারেন আদর্শ। আদর্শ হয়ে উঠতে পারেন আজ কাল পরশুর ডাক্তারি পড়ুয়াদরে কাছে। শুধু এই বঙ্গসন্তানের জীবনের ইতিহাসটুকু পৌঁছে দেওয়া চাই তাঁদের কাছে। চর্চা চাই নীলরতনের, নরম্যান বেথুনের। চাপচাপ অন্ধকারের বুকে একটা দুটো তারার আলো ফুটিয়ে রেখেছেন যাঁরা, তাঁদের নিয়ে চাই আলোচনা। একতরফা মেনে নেওয়া নয়, চাই বিতর্ক। যুক্তির আদানপ্রদান। চাই সঠিক তথ্যের আদানপ্রদান। অন্তর্জালবাহিত আধাঝুটা তথ্য নয়, সত্যিকারের সত্যি তথ্য। তবেই তো চেনা যাবে ডাক্তার নীলরতনকে। দেশপ্রেমিক নীলরতনকে। মানবপ্রেমে প্রাণিত নীলরতনকে। ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও।

দ্বেষ-বিদ্বেষ, হিংসা-কুটিলতা, পরশ্রীকাতরতা-পরনিন্দার আপাতসরল হাতছানি কোনও দিন স্পর্শ করতে পারে নি নীলরতনকে। আলোর পথযাত্রী নীলরতন কর্মমুখর আজীবন। যুক্তিবাদী আমরণ। নতুনকে আবাহন করেছেন সারা জীবন জুড়ে। শিখিয়েছেন জীর্ণ-দীর্ণ পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকার মৌতাতে ডুবে না থাকতে। কোনও বাণী নেই তাঁর। তাঁর একমাত্র বাণী তাঁর জীবন। আরও গভীরে ভাবতে বসলে, তাঁর একক সংগ্রাম, তাঁর হার-মানতে-না-জানা আদর্শবোধ। তাঁর সংস্কারমুক্ত জীবন-ইতিহাস।

ধর্মের হুজুগে, গড্ডালিকায় যুক্ত হবার অভ্যাস আজ সংক্রামক। তথাকথিত অধর্মে অবগাহনও তাই। এমন এক অস্থির সময়ে, বিপন্ন এক কালে ব্রাহ্মধর্মে আমৃত্যু বিশ্বাসী ডাক্তার নীলরতন সরকার আজও দেখাতে পারেন পথের দিশা। দিতে পারেন মানবধর্মের সন্ধান। যে ধর্ম মানবকল্যাণের কথা বলে। বলে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে। বিধ্বস্ত মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে। মানুষ আজ সত্যিই বড় কাঁদছে। যন্ত্রণার শেষ নেই অসংখ্য মানুষের। আর্তের, বঞ্চিতের, পীড়িতের। আজীবন এইসব হতভাগ্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন নীলরতন। মুছে দিয়েছেন নয়নজল, হাসি ফুটিয়েছেন আর্তের মুখে।

ধার্মিক হয়েও ডাক্তার নীলরতন সরকার আজকের প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত না-ধার্মিক। মানবতারহিত ধর্মে চরম অবিশ্বাসী। 'No form of religion has any life value today, which fails to yield a living inspiration to social services - more especially the service of the and overburdened, the afflicted and the down-cast, the opressed and the fallen'। ক'জন ধার্মিক বলতে পারেন এরকম কথা?

হতাশাগ্রস্ত, চাপজর্জর, পিছিয়ে পড়া, মুখ থুবড়ে পড়া নিম্নবিত্তের-দরিদ্রের-পীড়িতের পাশে দাঁড়ানোর কথা এভাবে আজ আর কে বলবেন! কে বলবেন ভালবাসাহীন-আচারসর্বস্ব-অমানবিক ধর্মের অসারতার কথা, অর্থহীনতার কথা! আজকের ধর্মব্যবসার যুগেও তাই ভরসা সেই মানবধর্মে আজীবন অটল ডাক্তার নীলরতন সরকার। সার্ধজন্মশতবর্ষে নীলরতন সরকারের জীবনের ইতিহাস নিয়ে, তাঁর দেশপ্রেমের-মানবপ্রেমের-স্বাদেশিকতার-শিক্ষার আদর্শ নিয়ে চর্চা তাই জরুরি।

আমৃত্যু আলোর পথযাত্রী রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র-নীলরতনের মতো কত বঙ্গসন্তান। তবু বঙ্গে আজও, 'এখনও গেল না আঁধার'। তিমিরবিলাসী বাঙালি আমরা। তিমিরবিনাশী মহাপ্রাণ মানুষের থেকে কিছুই চাই নি শিখতে। ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টাটা তো অন্তত শুরু করা যায়। শুরু করা যায় শিখতে। শুধু মগজ দিয়ে শেখা নয়, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা। আলোর পথযাত্রী নীলরতন যে তাই শিখিয়ে গেলেন আজীবন।

দেড়শো বছরে সেই মহাপ্রাণকে শুধু প্রণাম নয়, নয় শুধু শ্রদ্ধার নিবেদন, তাঁর জীবন থেকে মানুষ হবার মন্ত্রটুকু শিখে নিতে পারলে সম্মান পাবে নীলরতনের স্মৃতি। তার আগে অবশ্য বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে আনা চাই আলোর পথযাত্রী এই বঙ্গসন্তানকে।

তথ্যসূত্র:

- নীলরতন সরকার, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বই-চিত্র ও সুতানুটি বইমেলার যুগ্মপ্রয়াস, মার্চ ২০১১।
- পিতৃদেব স্মরণে, নলিনী দেবী, বোস ইনসটিটিউট প্রকাশিত পুস্তিকা
- নীলরতন সরকার, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, প্রবাসী ১৩৫২
- ডাক্তার নীলরতন সরকার, সুবীরকুমার লাহিড়ী, প্রবাসী ১৩৫৪
- বিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদ, দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৫. ৬. ২০০৮
- Golden Book of Tagore, ed. by Rammohan Chatterjee et. al., 1991 ।

উমা

প্রাক-স্বাধীনতা বাংলা পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ ঃ কিছু খণ্ডচিত্র

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ বলতে এই একুশ শতকের স্বাধীন ভারতে আমাদের মনে যে সব সমস্যার কথা ভেসে ওঠে গত শতকের ব্রিটিশ ভারতেও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলো মুখ্যত তা থেকে খুব অন্যরকম ছিল না। তবে যে-ব্যাপারটি এই এক শতকে অনেকটা বিবর্তিত হয়েছে, তা হলো পত্রপত্রিকায় সাংবাদিকদের এই প্রসঙ্গগুলি নাড়াচাড়া করার ধরনটি। স্বাধীনতার পর, বিশেষ করে ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন, ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরকারি নীতি হিসেবে ঘোষণা, সাধারণ পাঠকের শিক্ষার মানোন্নয়ন, ভোটের রাজনীতি ও সংবাদপত্র গোষ্ঠীর নানা ব্যবসায়িক নীতিকৌশল ইত্যাদি কারণ একক বা সম্মিলিতভাবে সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ তুলে ধরার ধরনটির বিবর্তনের পেছনে কাজ করে থাকতে পারে। তবে কারণ যা-ই হোক না কেন, আপাতত আমাদের অন্বিষ্ট হচ্ছে বাংলা পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন ও পর্যালোচনার সূত্রে সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গগুলি উপস্থাপনার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীটি সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা তৈরির চেষ্টা করা। স্বীকার করা ভালো, এ নিয়ে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পরিসর ও সুযোগ এখানে নেই। এখনকার মতো আমরা নির্ভর করবো প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেকার মাসিক বসুমতীর নানা সংখ্যায় প্রকাশিত কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের ওপর। একথাও প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ আলোচনার নীতিটি বিভিন্ন পত্রিকার ক্ষেত্রেও কিছুটা বিভিন্ন হওয়াই সম্ভব। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মন্তব্য আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করলে অবশ্যই স্পষ্টতর ধারণা গড়ে তোলা যেত। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এখানে সে সুযোগ নেই।

আমাদের আলোচ্য সময়কালে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি সাময়িক পত্রগুলি শুধু জনপ্রিয়ই ছিল না, সাহিত্যপিপাসু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীভুক্ত পাঠক সমাজের জনমত গঠনে এ গুলির প্রভাবও ছিল অনস্বীকার্য। মাসিক বসুমতীর ১৯২৬ সালের পাঁচটি সংখ্যা সমীক্ষার জন্য আমরা দেখবো এই কয়েকটি সংখ্যায় যে-সব সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গের আলোচনা আমাদের চোখে পড়ে, তার মধ্যে রয়েছে: কলকাতায় হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রায় মসজিদের সামনে 'গীতবাদ্য' নিয়ে বিরোধ ও দাঙ্গা,

এ নিয়ে সরকার, অ্যাংলো ইনডিয়ান সম্প্রদায় ও কংগ্রেস তথা মুসলিম লীগের নানা নেতার ভূমিকার সমালোচনা, বাংলাদেশের নানাস্থানে দেবালয়ের ওপর আক্রমণ, খুন ও নারী নির্যাতন এমন কি পুলিশের ওপর দাঙ্গাবাজদের আক্রমণ ও কোথাও কোথাও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'র সাময়িক প্রসঙ্গ বিভাগে লেখা হচ্ছে: "... সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘর্ষের প্রভাব বাঙ্গালায় বহুকাল অনুভূত হয় নাই, গত বৎসরে তাহারও সূত্রপাত হইয়াছে। এ সংঘর্ষের ফলে দেশের মুক্তির আশা সুদূর পরাহত হইল। জাতি মোহে অন্ধ না হইলে এমন করিয়া আত্মঘাতী হয় না। বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান এতদিন সদ্ভাবে বসবাস করিয়া আসিয়াছে, আজ জানি না কোন্ বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে ইহাতেও অন্তরায় উপস্থিত হইল। ... নীচ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে যাহারা জাতিগত বিদ্বেষ-বিষ উদ্গিরণ করে, তাহাদিগকে হিন্দু-মুসলমান কবে বিষবৎ বর্জন করিতে শিখিবে?..." ['অতীত ও বর্তমান'] লক্ষণীয় যে এখানে হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের ভাই ও বাঙলাকে 'উভয়েরই জন্মভূমি' বলে মেনে নিয়ে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, এই বিরোধে 'দেশের ক্ষতি, জাতির ক্ষতি, সাহিত্যের ক্ষতি, ব্যবসায়ের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি' এবং প্রকৃত ধর্ম সকলের পক্ষেই এক' ইত্যাদি।

স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কারা বিদ্বেষ-বিষ ছড়ায়, এ সম্পর্কে

পত্রিকাটি পরবর্তী সন্দর্ভেই ইঙ্গিত করেছে 'হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্যতম পুরোহিত' মওলানা মহম্মদ আলির 'ধর্ম প্রথমে, তারপরে দেশ'—কলকাতার দাঙ্গা প্রসঙ্গে এই উক্তিটির এবং ঐ প্রসঙ্গে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্ররোচনামূলক নানা কথার সমালোচনাও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁদের হাদিস থেকে মহম্মদের এই বাণীও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—'যাহার স্বদেশ প্রেম নাই সে প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মুসলমান নহে।' এই প্রতিবেদকের মতে—'হিন্দু সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করে সম্মান করে' ও 'এই ভারতকে তাহার একলার দেশ বলিয়া মনে করে না, করিলে মুসলমানেরও আপদে বিপদে বুক দিয়া পড়িত না।' এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের প্লাবনে বা মাদারীপুরের বাত্যায় কারা অধিক সাহায্য নিয়েছে, যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফল মুসলমান ভোগ করছে, তার প্রতিষ্ঠায় ও উন্নতিতে কারা বেশি উদ্যোগ নিয়েছে—এই সব প্রশ্ন করে মন্তব্য করা হয়েছে: 'হিন্দুরা স্বরাজ বা দেশের মুক্তির সহিত ধর্মকে সংশ্লিষ্ট করিতে চাহে না, মুসলমানও যদি ধর্মকে প্রথম স্থান দিবার পর দেশের উন্নতির কথায় ধর্মকে আনয়ন না করেন, তাহা হইলেই ত বিরোধের মূল দূর হয়।' ['বিকৃত উপদেশ', ঐ] এই প্রতিবেদনটির লেখক ছিলেন সত্যেন্দ্রকুমার বসু—পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক অপর [সম্পাদক—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]।

একই সংখ্যায় আরও দু'টি সচিত্র প্রতিবেদন দেখা যাচ্ছে, যাতে প্রতিবেদকের নাম নেই। 'সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ' শীর্ষক প্রতিবেদনে কলকাতার নৃশংস দাঙ্গাকে ইংরাজি শাসনের পক্ষে 'কলঙ্কের কথা' বলে মন্তব্য করা হয়েছে, কারণ কলকাতা 'ইংরাজের হাতে গড়া' শহর। ভারতে এ-রকম দাঙ্গা নতুন নয়—অ্যাংলো ইন্ডিয়ান 'পত্রসমূহের আগুনের আঁচ হইতে নিরাপদ স্থানে থাকিয়া বিজ্ঞের মতো' এই মন্তব্যের সমালোচনা করে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে—অতীতে মুসলিম শাসনকালে, বা সমকালে দেশীয় রাজ্যসমূহে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সঙ্গেই বসবাস করেছে ও করছে। তাই এই বিরোধের জন্য ভারতীয়েরা স্বশাসনের অধিকার পাবার যোগ্য নয়—অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহলের এই ইঙ্গিত ভিত্তিহীন। অপরপক্ষে আর্যসমাজের শুদ্ধি আন্দোলন ও সংগঠনই এই দাঙ্গার কারণ—মওলানা মহম্মদ আলি প্রমুখের এই অভিযোগও খণ্ডন করে প্রতিবেদক জানিয়েছেন যে, ধর্মত্যাগীদের শুদ্ধির পর আর্যসমাজে ফিরিয়ে নেবার আন্দোলনে হিন্দুসমাজের সায় নেই, তবে 'সংগঠনে সকল হিন্দুরই সহানুভূতি আছে এবং থাকিবে। যাহাতে হিন্দু শক্তিশালী হয় তাহাতে কোন হিন্দুরই আপত্তির কথা থাকিতে পারে না।' তাঁর মতে দুইপক্ষের মধ্যে একপক্ষ সবল হলে তার অন্যায় দাবী বারবার দুর্বল পক্ষকে মেনে নিতেই হবে। প্রকৃত সাম্প্রদায়িক মিলন তাই সম্ভব হবে না। 'মুসলমানরা বাঙ্গালায় সংখ্যায় অধিক ও প্রবল, তাঁহাদের আঞ্জুমান ও তাঞ্জিম আছে, 'হিন্দু'র কিছুই ছিল না, সুতরাং এখন যদি হিন্দুরা হিন্দু-সভা বা হিন্দু সংগঠন করিতে কৃতসংকল্প হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে অপরাধী করা যায় না।...' বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রতিবেদনে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে-সব জেলায় মুসলিম সম্প্রদায় শক্তিশালী [উত্তরবঙ্গ, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, ইত্যাদি], সেখানে দেবমন্দির ভগ্ন, শোভাযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা ও হিন্দুদের লাঞ্ছনা ও দণ্ডভোগ করতে হয়েছে এবং হিন্দু-সংখ্যাধিক্যবিশিষ্ট অঞ্চলে এমন ঘটনা ঘটেনি, এমন কি বর্দ্ধমানে মসজিদের সামনে দিয়ে যাবার সময় হিন্দুরা হরিসংকীর্তন বন্ধ করলে 'মুসলমানরা তাহাদের স্বচ্ছন্দে সংকীর্তন করিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন।...'

কলকাতার আলোচ্য দাঙ্গার কিছু বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের চেষ্টাও এই প্রতিবেদনে হয়েছিল, যেমন—অজ্ঞ গুণ্ডাদের পেছনে স্বার্থসন্ধানী চতুর লোকের বুদ্ধিবল, সংঘবদ্ধ গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের নিজেদের ধনপ্রাণ ও ইজ্জৎরক্ষার জন্য রুখে দাঁড়ানো [মেছুয়াবাজার পাড়ায় এই প্রচেষ্টায় চন্দ্রকান্ত দেব ও যতীন্দ্রমোহন শূর নামে দুই যুবক প্রাণ দেন], দাঙ্গা প্রসঙ্গে প্ররোচনামূলক গুপ্ত ইস্তাহার বিলি, কোনো কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি গুণ্ডাদের পৃষ্ঠপোষণা, পূর্ব নজির না থাকা সত্ত্বেও, 'সম্প্রতি কি কারণে জানি না' মসজিদের সম্মুখে হিন্দুদের শোভাযাত্রায় মুসলমানের আপত্তি, কোনো কোনো পল্লীর যুবকদের দাঙ্গার সময় জনহিতকর কাজে যোগদান, এক সম্প্রদায়ের বিপদে অন্য সম্প্রদায়ের সহায়তা, দাঙ্গায় দমকল ও অ্যাম্বুলেন্স বিভাগের প্রশংসনীয় কাজ ইত্যাদি। সবশেষে প্রতিবেদকের পর্যবেক্ষণ 'উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনোমালিন্যের ফলে দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ঝড় এখনও মরে নাই।' বিশেষ করে আলি-ভাইদের নানা মন্তব্যে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে উভয়পক্ষের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে—'তাহার পর দেখা যাউক, উভয় পক্ষই কতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া প্রকৃত মিলন ঘটাইতে ইচ্ছা করেন।'

হিন্দুদের উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদকের একটি পরামর্শ ঃ যেহেতু ঐ দাঙ্গায় কলকাতার ডোম, দোসাদ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকও অনেক সময় গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে দেবালয় রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, তাই এদের অস্পৃশ্য বলে দূরে না ঠেলে গান্ধীর কথা মতো সকল শ্রেণী হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে একে শক্তিশালী করা হোক। এই প্রতিবেদনের সঙ্গে ছাপা আলোকচিত্রগুলির পরিচিতি ছিল এরকম: জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের ভগ্ন শিবমন্দির, বড়বাজারের জুম্মা মসজিদ ও ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীতে পাহারা, মেছুয়াবাজার ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে মিলিটারি পাহারা, নিহত যুবাদ্বয় যতীন্দ্র ও চন্দ্রকান্তের মৃতদেহ, বীর যুবকদ্বয়ের শোভাযাত্রা, দমকল ও দগ্ধ পাটের গাড়ী, আমহার্স্ট স্ট্রীটে পাটের গাড়ি দগ্ধ, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, প্রেসিডেন্সি কলেজের

দারোয়ানের শবযাত্রা, ঘেসোপটীর অগ্নিদগ্ধ গৃহ। 'মিলন' নামে একটি ব্যঙ্গচিত্রে কোলাকুলির ভঙ্গীতে হিন্দু-মুসলিমকে দেখানো হয়েছিল, যাদের চাউনিতে প্রীতির কোনো চিহ্ন নেই, পাশে এক বেয়নেটধারী পুলিশ দেঁতো হাসি হাসছে।

'কলিকাতায় শিখ মিছিল' নামক প্রতিবেদনটিতে গুরুগোবিন্দের সচিত্র জীবনী সহ উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইতিপূর্বে আর্যসমাজী ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গার সময় এক গুরুদ্বারে অগ্নিসংযোগ ও শিখ ধর্মগ্রন্থ পোড়ানো হয়েছিল। চৈত্রসংক্রান্তির দিনে শিখরা ঐ গুরুদ্বারে গ্রন্থসাহেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সেদিন কোনো শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়নি, হিন্দুদের চড়কের শোভাযাত্রাও নিষিদ্ধ করা হয়। যদিও ইদের দিন বাদ্যসহকারে মুসলমান পেশোয়ারীদের শোভাযাত্রা নিয়ে গড়ের মাঠে যেতে দেওয়া হয়েছিল। বাঙ্গালার গবর্নর লর্ড লিটন নিজের লাটপ্রাসাদে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ডেকে মীমাংসার চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈঠকে 'মুসলমান নেতৃবর্গের জিদের ফলে আশানুরূপ মীমাংসা হয় নাই।' শেষপর্যন্ত এদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে নাকি লর্ড লিটন নিজের দায়িত্বে ৯ই মে শিখদের মিছিল করার ও কোনো কোনো 'মসজিদের সম্মুখে বাদ্যাদি' করবার অনুমতি দেন। এই প্রতিবেদনের সঙ্গে কলকাতার নানা অঞ্চলে শিখ মিছিলের ও অশ্বপৃষ্ঠে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সেই মিছিলে যোগদানের বহু ছবি ছাপা হয়েছিল।

'মাসিক বসুমতী'র এই সংখ্যাতেই 'কলিকাতার দাঙ্গা' শীর্ষক একটি নিবন্ধে সুপরিচিত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী কয়েক বছর ধরে মালাবারে, কোহাটে, দিল্লিতে, প্রয়াগে, লখনৌতে, গুলবার্গে, সেকেন্দ্রাবাদে, মুলতানে যা ঘটেছে, তা রোগের, না স্বাস্থ্যের, কিসের লক্ষণ—শুরুতেই এই প্রশ্ন তুলে দায়ী করেছেন নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত ও নির্বোধ হিন্দু-মুসলমানদের। 'কুকুর বিড়ালের মত কামড়াকামড়ি করবার প্রেরণা যেখান থেকে আসে', উভয় সম্প্রদায়ের সেইসব নেতাদের। তাঁর বিশেষ কটাক্ষ ছিল 'রাতারাতি মিস্টার থেকে মৌলানা' হয়ে ওঠা মহম্মদ আলির প্রতি। অবশ্য তিনি এই ভরসাও প্রকাশ করেছিলেন যে, ইংরাজরা এদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষজাত বিরাট অগ্নিকাণ্ড ...কিছুতেই হতে দেবেন না। কারণ প্রথমতঃ তাঁরা রাজা—দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ইংরাজ।...' সবশেষে তিনিও স্বীকার করেছিলেন—'...হিন্দুর মনের সঙ্গে মুসলমানের যে মিল নেই—ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের সঙ্গে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন যে এক নয়—আজকের দিনে কারও পক্ষে তা অস্বীকার করা অসম্ভব।...'

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সাময়িক প্রসঙ্গে' দেশবন্ধু সম্পাদিত হিন্দু-মুসলিম চুক্তিকে [বেঙ্গল প্যাক্ট] বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্বরাজ্য দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের চেষ্টা ও অধিকাংশ সদস্যের ওই চুক্তি নাকচ করে দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ সম্পর্কে লেখা হয়েছে ঃ—'...প্যাক্ট অর্থে এ যাবৎ হিন্দুর পক্ষে ত্যাগ স্বীকারের পর ত্যাগস্বীকার এবং মুসলমানের পক্ষে দাবীর পর দাবী চলিয়া আসিয়াছে।...' উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রতিবেদক সত্যেন্দ্রকুমার লিখেছেন যে, খিলাফতের প্রশ্নে হিন্দুরা চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে সব বিষয়ে মুসলমানদের সাহায্য করেছে, দুঃখ কষ্ট ও কারাদণ্ড ভোগ করেছে, অথচ 'খেলাফৎ উদ্ধারের' পর মুসলমান নেতৃবর্গ (আলি ভ্রাতারা সহ) সারা দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন, 'ব্যাঙের ছাতার মতো' গজিয়ে ওঠা মৌলানা ও মৌলভিদের প্ররোচনায় পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে বহু দেবস্থান কলুষিত হচ্ছে, এরপরও কি হিন্দু-মুসলিম চুক্তি ভাঙার জন্য হিন্দুদের অপরাধী করা উচিত! এই প্রতিবেদকের মতে, 'হিন্দু চিরদিনই শান্তিপ্রিয়, সে পরের দেবস্থানকে সম্মান করে, ... কিন্তু একপক্ষ অপরের ধর্মের প্রতি ক্রমাগত অবমাননা প্রদর্শন করিলে, অপরপক্ষ কি কেবল প্যাক্টের খাতিরে নীরবে অত্যাচার সহ্য করিবে? ... প্যাক্ট একপক্ষে হয় না, উভয়পক্ষকেই ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, অন্যথা প্যাক্টের সার্থকতা কি?' ['হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট']

'সাময়িক প্রসঙ্গে'র পরবর্তী অধ্যায় মসজিদের সামনে গীতবাদ্য হতে পারবে না বলে মুসলমানরা কিছুদিন ধরে যে দাবী তুলেছেন, সে-সম্পর্কে লেখা হয়েছে—'... এই নিষেধাজ্ঞা সকলের প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না, মস্‌জেদের সম্মুখে গোরা পল্টন ব্যান্ড বাজাইয়া জলস্থল কাঁপাইয়া যায়, মহরমের ভীম কাড়া-নাকাড়া বাজে, বুক চাপড়ানি ও গান হয়, ট্রাম-বাস প্রভৃতির ঘড়ঘড়ানি চলে, অথচ এসব ব্যাপারে আপত্তির কথা উঠিতে দেখি না। তবেই বুঝা যাইতেছে, মুসলমানের আপত্তি কেবল হিন্দুর শোভাযাত্রা ও উৎসবে।...' এই প্রসঙ্গে মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টায় লর্ড লিটনের প্রয়াস ও তাঁর গৃহীত 'মাঝামাঝি পন্থা'র আলোচনা করে মন্তব্য করা হয়—শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে হলেও এক সম্প্রদায়ের অন্যায় দাবীতে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে লর্ড লিটন যেভাবে উদ্যত হয়েছেন, তার সুদূরপ্রসারী ফল কি ভেবে দেখেছেন! ['মসজেদের সামনে গীতবাদ্য']

এর পরবর্তী এক অধ্যায়ে ১০ই জুন, ১৯২৬-এর ক্যালকাটা গেজেটে কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে পুলিশ কমিশনার আর্মস্ট্রং-এর বিবরণে 'বাঙালি হিন্দুরা কোথাও আক্রমণ করেনি, শুধু আত্মরক্ষা করেছে'—এই নিরপেক্ষ মন্তব্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলা হয়: '...মিঃ আর্মস্ট্রং যথার্থই বলিয়াছেন ... ইহাই বাঙালি হিন্দুর প্রকৃতি।' কিন্তু প্রতিবেদকের বক্তব্য, নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের ও আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত থাকতে হবে, তাই তাঁর আবেদন—সব সম্প্রদায়কে আত্মরক্ষার্থ ব্যায়ামচর্চার সুযোগ দেওয়া হোক। তবে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি দাঙ্গা প্রশমনে সাহায্য

না করে স্ব-স্ব-সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে, আর্মস্ট্রং-এর এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করা হয়। তৎকালীন ডেপুটি মেয়র সুরাবর্দি এক মসজিদ ভাঙার মিথ্যা খবর দিয়ে পুলিশ ও মিলিটারি ডেকে এনেছিলেন, একথার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এই অপরাধে সংবাদপত্রকে আদালতে টানাটানি করা হতো, 'কিন্তু ডেপুটি মেয়র সাহেবের সাত খুন মাপ!' ['দাঙ্গার বিবরণ']

এই বিভাগের পরবর্তী প্রসঙ্গ---বড় বাজারের সুতো-ব্যবসায়ীদের রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা নিয়ে পুলিশের অনুমতি সত্ত্বেও 'মুসলমানগণের অন্যায় জিদের ফলে এবং সহরের শান্তিরক্ষার অজুহাতে' শেষ মুহূর্তে পূর্ব নির্দিষ্ট পথ দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার ব্যাপারে পুলিশের নিষেধাজ্ঞা জারীর বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ। ['দাঙ্গার বিবরণ'] আষাঢ় সংখ্যার 'সাময়িক প্রসঙ্গে' বিভাগেও দাঙ্গা সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি নিয়ে সমালোচনা দেখা যাচ্ছে। কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে ব্রিটেনের 'টাইম্‌স' পত্রিকাটি মন্তব্য করেছিল—ভারতে জাতিগত বিদ্বেষের যেমন প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে, যতদিন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন দাঙ্গা নিবারণের জন্য প্রাদেশিক সরকারের হাতে সংরক্ষিত বিভাগগুলি রক্ষা করা দরকার। এ প্রসঙ্গে প্রতিবেদক সত্যেন্দ্রকুমার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যখনই রাজনৈতিক অধিকার দেবার প্রশ্ন ওঠে, ব্রিটিশ সরকারের এরকম সাম্প্রদায়িক অজুহাত তোলাটা নতুন নয় অথচ আয়ার্ল্যান্ডে এরকম সংঘর্ষ সত্ত্বেও সেখানে রাজনৈতিক অধিকার প্রদানে বাধা ঘটেনি 'বৃটিশ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া' যতটুকু অধিকার দেওয়া সম্ভব, ততটুকুই ভারতীয়দের দেবার ব্রিটিশ নীতির তীব্র সমালোচনা করে শেষপর্যন্ত বলা হয়, লর্ড রেডিংএর মতো সাম্রাজ্যবাদীরা যা-ই বলুন না কেন, মুক্তির অধিকার দানের সামগ্রী নয়। জাতি স্বাবলম্বী হলে হিন্দু মুসলমান মিলিত হলে ভারতবাসীকে 'মুক্তিধন' থেকে বঞ্চিত করা কারও সাধ্য নয়। ['দাঙ্গা ও সংস্কার আইন'] আর একটি সন্দর্ভে মসজিদের সামনে গীতবাদ্য নিয়ে বাংলার লাটসাহেবের আপোষমূলক বন্দোবস্তের সমালোচনা করা হয়েছে, সে সঙ্গে কিছু হিন্দু রাজনীতিক (যথা, সরোজিনী নাইডু) 'ক্ষমাঘৃণা করিয়া' মুসলমানদের কিছুকিছু অধিকার ছেড়ে দেবার যে কথা বলছেন, সে নিয়েও আপত্তি করা হয়েছে। ['মসজেদের সামনে গীতবাদ্য]

আষাঢ় সংখ্যাতেই এই বিভাগের আর একটি সন্দর্ভে অন্তরালে থেকে যারা অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে ধর্মান্ধতার বিষ ছড়াচ্ছে, তাদের সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এদের প্রচারের ফলেই পাবনা-কুস্টিয়া-চট্টগ্রামের অনাচার ও হঠাৎ মসজিদের সামনে গীতবাদ্য নিয়ে বিরোধের উদ্ভব হয়েছে বলে প্রতিবেদক মনে করেছেন। কুস্টিয়ায় হিন্দুতীর্থযাত্রীদের ওপর আক্রমণের সময় মধু শেখ নামে এক যুবক দু'জন অপহৃতা হিন্দুনারীকে উদ্ধার করেছিল—একথারও সপ্রশংস উল্লেখ লক্ষণীয়। ['অনাচারের মূল কোথায়?']

শ্রাবণ সংখ্যায় 'সাময়িক প্রসঙ্গ'তে মুসলিম সমাজের যে সব 'ভুঁইফোঁড় নেতা মসজিদের সামনে গীতবাদ্য নিয়ে হঠাৎ আপত্তি তুলছেন, তাদের তুলোধোনা করা হয়েছে ও এ জাতীয় আপত্তির ফলেই পাইকপাড়ায় রথযাত্রার সময় দাঙ্গা বাঁধে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে-সব মুসলমান মান্যব্যক্তি এই জাতীয় বাদ্যধ্বনি নিয়ে আপত্তি উচিত নয় মনে করেন, তাদের মত উদ্ধৃত করে সবশেষে জানানো হয়েছে, কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলোও এ ব্যাপারে মুসলমানদেরই দোষী করেছে। ['ভুঁইফোঁড় নেতা']

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে লর্ড আরউইন উভয় সম্প্রদায়ের মনোভাবের পরিবর্তন দরকার বলে যে মন্তব্য করেন, একটি সন্দর্ভে তাকে সমর্থন করেও জানানো হয়েছে, আলিগড়ে স্যার আবদর রহিমের বিস্ফোরক মন্তব্যের মূলে যে মনোবৃত্তি নিহিত, তা-ই বিরোধের মূলে। মুসলমানরাই ইংরেজের আগে 'রাজার জাতি' ছিল। তারা একথা প্রতিপন্ন করতে চায় সংস্কার-আইনের শ্রেষ্ঠ ফল ভোগের উদ্দেশ্যে—ডঃ মুঞ্জের এই মতকেও সমর্থন করা হয়েছে। ['বড় লাটের উপদেশ'] ফ্রী প্রেসের কাছে হিন্দু সংগঠনের নেতারাও সাম্প্রদায়িক বিরোধের মুসলিম নেতাদের মতো সমান দায়ী— সরোজিনী নাইডুর এই মন্তব্যকে আক্রমণ করে একটি সন্দর্ভে মন্তব্য করা হয়েছে। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদে কাটানোর কারণে তাঁর মুসলিম প্রীতি বিস্ময়কর নয়। আলিগড়ে স্যার আবদার রহিমের সাম্প্রদায়িকতা বক্তৃতার কথা স্মরণ করিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, হিন্দু নেতাদের সম্পর্কে সরোজিনীর অভিযোগের প্রমাণ কোথায়! ['কংগ্রেস-নেতার নিরপেক্ষতা'] হিন্দু সংগঠনের পোষকতা করে সবশেষে হিন্দু-গৌরব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নানা মনীষীর নাম করে বলা হয়েছে: 'কংগ্রেস, কাউন্সিল, স্বরাজ—এখন দূরের কথা, এখন হিন্দুর হিন্দু হওয়াই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।...'

এই সংখ্যাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে নির্যাতিতা হিন্দু নারীদের ও চাপে পড়ে কলমা পড়া বা বাধ্য হয়ে 'নিষিদ্ধ খাদ্য' খেয়ে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্তের পর হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নেবার পক্ষে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়েছে। ['নির্য্যাতিতা হিন্দুনারী'] মসজিদের সামনে গীতবাদ্য নিয়ে রফার শর্তগুলি নিয়ে একটি সন্দর্ভে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে ও এ নিয়ে স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের দৌত্য প্রসঙ্গে কলকাতার নানা স্থানে হিন্দুদের পূজাপার্বণে বাজনা বন্ধের দাবীর উল্লেখ করে ঐ দৌত্য সফল হবে কিনা, সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ['আবদারের বন্যা'] আর একটি সন্দর্ভে কলকাতার নানাস্থানে ও পাবনায় নানা উপলক্ষে হিন্দু-মুসলিম বিবাদের ৮/৯টি ঘটনার বিবরণ দিয়ে

'হিন্দুর পক্ষ হইতে' জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যে সব মুসলমান এই সব বিরোধ ও আইনভঙ্গের জন্য দায়ী, তাদের 'রীতিমতো দণ্ডের' ব্যবস্থা হয়েছে তো! ['অপরাধ কাহার']

শ্রাবণ সংখ্যায় বিলেতের 'টাইম্‌স' পত্রিকায় প্রাক্তন ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার ভারতের সরকারি কর্মচারীদের মুসলমানদের পক্ষপাতিত্বই এদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ বলে যে মন্তব্য করেন ও পার্লামেন্টে 'বর্তমান ভারতসচিব' লর্ড বার্কেনহেড ঐ অভিযোগ অস্বীকার করে যে প্রতিবাদ করেন তারও আলোচনা দেখা যায় একটি সন্দর্ভে ['পার্লামেন্টে ওকালতি'] দু'জন হিন্দু নেতা ডঃ মুঞ্জে ও মদনমোহন মালবীয়ের ও বাঙলা সরকারের ১৪৪ ধারা প্রয়োগের তীব্রনিন্দা করা হয়েছে শ্রাবণ সংখ্যার 'সাময়িক প্রসঙ্গে'র আর একটি সন্দর্ভে ['বাঙ্গালা সরকারের বুদ্ধিভ্রংশ'] আলি ভ্রাতৃদ্বয়, স্যার আবদর রহিম ও তাঁর 'দোসর' হাজী গজনভি প্রমুখের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে নিয়মানুগ পথে হিন্দু-মুসলিম প্রীতিকামী পণ্ডিত মালবীয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা কেমন বিচার—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ প্রকাশ্যেই এ প্রশ্ন তুলেছেন বলে জানানো হয়েছে। প্রতিবেদকের মতে সারা ভারতের হিন্দুদের মধ্যে রব উঠেছে যে, লর্ড অলিভিয়ার কথাই সত্যি।

ভাদ্র সংখ্যায় এই বিভাগেই কলকাতার দাঙ্গা হাঙ্গামা সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে 'ফরোয়ার্ড' ও 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার নামে যে মামলা আনা হয়েছিল, তার আলোচনা করা হয়েছে। 'ফরোয়ার্ড' একটি মুসলিম প্রচার পুস্তিকা উদ্ধৃত হয়েছিল বলেও 'দৈনিক বসুমতী' কলকাতায় দাঙ্গা চালিয়ে যাবার জন্য অর্থসাহায্যের আশ্বাস দিয়ে নাখোদা মসজিদের ইমামের কাছে মরিশাসের এক ব্যক্তির তারবার্তা প্রকাশ করেছিল পত্রিকা দুটি বলে নিম্ন আদালতে দণ্ডিত হয় ও উচ্চতর আদালতে আবেদন করে দুটি পত্রিকাই নির্দোষ সাব্যস্ত হয়। প্রতিবেদকের মতে—দু'টি পত্রিকাই যা ছেপেছিল, তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও তার উদ্দেশ্য ছিল সত্যানুসন্ধান ও সত্যপ্রকাশ, বিদ্বেষ প্রচার নয়। উদ্দেশ্য বিচার না করে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি-প্রচারক এই দুটি পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ফলে যে অনর্থক হয়রানি ও অর্থব্যয় হলো, তার ক্ষতিপূরণ কে করবে—সবশেষে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ['সম্পাদকের দায়িত্ব']

'সাম্প্রদায়িক বিরোধ' নামে একটি সন্দর্ভে ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক বিবাদ নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-ভিত্তিক সংস্কার আইন অনুসারে নির্বাচন ও সরকারের মোটা বেতনের চাকরীর প্রলোভনই এই বিরোধ বৃদ্ধির কারণ। প্রতিবেদকের মতে 'যুগাবতার' ও 'ভবিষ্যদ্দর্শী' মহাত্মা গান্ধী এইজন্যই নাকি দেশবাসীকে কাউন্সিলের মোহ ত্যাগ করতে বলেছেন। কিন্তু স্বরাজ্য দলের নেতারা আগামী নির্বাচনে প্যাক্টের মুখরক্ষার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, তাঁদের একাংশ মুসলমানদের মন জুগিয়ে চলছেন। এই অবস্থায় এই বিরোধের সমাধান গান্ধীজীরও সাধ্যায়ত্ত নয়। তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের চেয়ে যে দেশের স্বার্থ বড়, বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের এ কথা বোঝার মতো অবস্থা নয়। সর্বশেষ সন্দর্ভের বিষয় হচ্ছে খিদিরপুরে মসজিদের সামনে দিয়ে জন্মাষ্টমীর মিছিল নিয়ে দাঙ্গা—যেখানে মুসলমানদের হাতে হিন্দুদের সঙ্গে পুলিশও প্রহৃত হয়। [বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে]। প্রতিবেদকের মন্তব্য: 'গীতবাদ্য হিন্দুর ধর্মের অঙ্গ। মুসলমানের অন্যায় আবদারে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিতে পারেনা।' যারা অন্তরালে থেকে দাঙ্গা বাঁধায়, তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি না দিলে কোনো কাজ হবে না, একথা আবার উচ্চারণ করা হয়েছে। ['অপরাধী কে?']

মোটের ওপর 'মাসিক বসুমতী'র সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গে বক্তব্যগুলি নাড়াচাড়া করলে যা পাওয়া যায়, তা হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জরুরী, একথা স্বীকার করলেও হিন্দুসমাজের ধর্মীয়

অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পত্রিকাটি প্রস্তুত নয়। আপোষের জন্য দু'পক্ষের ত্যাগ স্বীকারের কথা বললেও সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য দু'পক্ষই সমান দায়ী—এ কথা মেনে নিতে পত্রিকাটি রাজী নয়। মুসলিমদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে মনে হলে সরকার বা সর্বভারতীয় নেতা—কাউকেই 'মাসিক বসুমতী' ছেড়ে কথা বলেনি। খোলাখুলি একটি সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করে দোষারোপ বা হিন্দু সংগঠনের পক্ষে দ্বিধাহীন প্রচার—এ ব্যাপারগুলি অবশ্য কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় পরিচালিত বা তাঁদের পরিচালিত কোনো পত্রিকাতেই বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় না [সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কলমচি বা তাঁদের পরিচালিত পত্রিকার লেখকেরা হয়তো কখনও কখনও সূক্ষ্মভাবে সুকৌশলে এ কাজটি করেন]। এর একটি কারণ এই হতে পারে, অবিভক্ত বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু ছিল বলে, সেই ভীতিই এরকম নীতির জন্ম দিয়েছিল, আজকের পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক অনুপাত পরিবর্তিত হওয়ায় হিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকেরা কাগজে কলমে অনেকটা অনুগ্র ও উদার হতে পেরেছেন। অবশ্য জনসাধারণের মন কতটা পরিবর্তিত হয়েছে, সেটি ভিন্ন বিতর্কের বিষয়।

উমা

পাউডার এবং ঘামাচির কথা

জয়ন্ত দাস

আমাদের ছোটোবেলায় মানে ষাট-সত্তরের দশকে সানস্ক্রিন ফেয়ারনেস ক্রিম ইত্যাদির চল হয় নি। ফরসা হবার সহজ উপায় ছিল কষে সাবান মাখা, ছোবড়া ঘষা আর মুখে একপোঁচ পাউডার মেখে নেওয়া। আর ছোটোবড় শিশি-বোতলে কি সব ক্রিম থাকত, তার ওপরে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার কথা লেখা থাকলেও ফরসা হবার কথা বিশেষ থাকত না। আজ এতোকিছু ফরসা হবার আর ত্বকের যত্ন-আত্তি করার ক্রিম-লোশন-নাইটক্রিম-ফেসওয়াশ ইত্যাদির বাড়াবাড়ির দিনে বঙ্কিম বেঁচে থাকলে নির্ঘাত বলতেন, পাউডার, তোমার সে দিন গিয়াছে!

গিয়াছে কি? ভারতের প্রসাধনশিল্প বা প্রসাধন-ব্যবসা কিন্তু সেরকমটি বলে না। আর ভারতের প্রসাধনশিল্প-ব্যবসাকে খাটো করবেন না। ২০০৯ সালে এদেশে প্রসাধন বিক্রির পরিমাণ ছিল ৩৫৬ বিলিয়ন ডলার, টাকার হিসেবে (৩৫ হাজার ৬০০ কোটি)। আমাদের মতো দেশে এটা নেহাত কম নয়। আর এই ব্যবসা দিনে দিনে বাড়ছে। এত দ্রুত বোধকরি তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও বাড়ছে না। ফরসা হবার ক্রিম, যে কিনা এই সেদিনও নিজেকে ঠিকভাবে 'ফরসা করে তবেই ছাড়ি' বলে জাহির করত না, সেটাই এখন বিক্রির দিক দিয়ে একনম্বর জায়গায়। শ্যাম্পুর বাজারও বিশাল। তবু পাউডারের বাজার নেহাত ফেলে দেবার মতো নয়।

পাউডার:

গরম পড়ছে। গরমকালে কতগুলো জিনিস এখন মধ্যবিত্ত বাঙালির না হলে নয়। তার মধ্যে একটা হলো পাউডার। পাউডার কিন্তু একরকমের নয়। মুখে মাখার রঙিন ফেস পাউডার। গায়ে মাখা পাউডার। ঘামাচির জন্য বিশেষ পাউডার। বাচ্চাদের জন্য বেবি পাউডার। আবার ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়, ডাক্তারবাবুরা মাখতে বলেন, এমন পাউডারও আছে। শেষের পাউডারগুলো আলাদা জাতের, পাউডার হিসেবে তাদের বিচার করলে ভুল হবে। যেমন ট্যাবলেট জিনিসটা খাই বলেই ট্যাবলেটের গুণের সঙ্গে ফিশ ফ্রাই-এর গুণের তুলনা চলে না, তেমনি আর কি। এগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব না।

অনেকে এমনিতে সাধারণ পাউডার মাখলেও গরমে মাখেন ঘামাচি মারার পাউডার। ঘামাচি মরে বা না মরে সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। মূলত মহিলারা সাজগোজ করবার সময় মুখে মাখেন ফেস পাউডার। আর বাচ্চাদের মাখান বেবি পাউডার। এ জিনিসগুলো কী, কতটা কাজের আর কতটা অকাজের, এমনকি, ক্ষতিকারক কিনা, সেটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

পাউডারের উপাদানগুলো নিয়ে লম্বা লিস্টি বানানো যেতেই পারে, কিন্তু আপাতত আমি সেটা ছোটো করে সারব। সব পাউডারের মূল উপাদান হল ট্যাল্ক। নিয়মমতো অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ট্যাল্ক থাকলে তবে সেটাকে 'ট্যালকম' পাউডার বলা যেতে পারে, নইলে ডাস্টিং পাউডার বলতে হবে। দ্বিতীয় জিনিসটাকে প্রসাধন 'গ্রেড' বলা যাবে না।

এবার বলার চেষ্টা করি 'ট্যালকম' পাউডার কী কী করে আর কী কী করে না। পাউডার মাখলে ত্বক বেশ মসৃণ লাগে, তার ওপর হাত বোলালে হাতটা যেন হড়কে যায়। এতে এমনিতে একটা আরামবোধ তো হয়ই, তা ছাড়াও বগল কুঁচকি ইত্যাদি যে সব জায়গায় ঘষা লেগে ছাল উঠে যায়, সেখানে ঘষা লাগাটা কমে, নিরাময় হয়। সত্যি কথা বলতে কি, গরমকালে অনেকেরই বগল কুঁচকি ইত্যাদি জায়গায় জ্বালা করে, আর তাঁরা ওষুধের দোকানের বিক্রেতার পরামর্শে বা আত্মীয়-বন্ধুর কথা শুনে নানা মলম লাগান। মুশকিল হল, প্রায়শই সেই মলমগুলোতে স্টেরয়েড থাকে, ফলে নানা ক্ষতিকর ও কষ্টকর পার্শ্বক্রিয়া হতে পারে। তার চাইতে বাজারে চালু 'ট্যালকম' পাউডার অনেক বেশি নিরাপদ। সমস্যা হল, ঘষা লাগা ছাড়া আরও অনেক কারণে বগল ও কুঁচকিতে জ্বালা করতে পারে, আর সেখানে ডাক্তার দেখানোই দরকার, প্রাথমিক পর্যায়ের পরে পাউডারের ওপর ভরসা রাখা ঠিক নয়।

এছাড়া পাউডার ত্বককে শুকনো করে, গরমে এর সুবিধে বলাই বাহুল্য। ট্যাল্ক নিজে জলে চট করে ভেজে না, অন্যদিকে গরমে ব্যবহার করার পাউডারে জলাকর্ষী নানা পদার্থ, যেমন স্টার্চ, চক, ইত্যাদি মেশানো হয়। স্টার্চ, চক—এরা জল শুষে নেয়, আর ট্যাল্ক তার ওপরে শুকনো হয়ে লেগে থাকে। আমাদের মতো আর্দ্র উষ্ণ দেশের জন্য এ খুব সুবিধেজনক।

এছাড়া পাউডারে থাকতে পারে ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক ইত্যাদি ধাতুর স্টিয়ারেট লবন। এরা টেকনিক্যাল গোত্রবিচারে সাবান জাতীয় বটে, কিন্তু পাউডারে এদের কাজ হল ত্বকের সঙ্গে পাউডার পদার্থটিকে সেঁটে থাকতে সাহায্য করা। এর অবশ্য কিছু অসুবিধেও আছে। স্টার্চ, চক, ও এই সাবান জাতীয় জিনিসগুলো ঘামের সঙ্গে মিশে চটচটে 'টুকরো পাউডার-খণ্ড' (কেক) তৈরি করতে পারে, সেটা ত্বকের জ্বালার কারণ হতে পারে।

প্রায় সব পাউডারে কিছু না কিছু সুগন্ধ মেশানো হয়। সেটা এমনিতে ভালোই লাগে, কিন্তু সমস্যা হয় তখনি যখন গন্ধদ্রব্যটিতে ব্যবহারকারী বা তার নিকটস্থ কারো অ্যালার্জি থাকে।

এবার আসা যাক বিভিন্ন পাউডারের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের কথায়। প্রথমে আসি ফেস-পাউডারের কথায়। এতে ঠিকঠাক রঙ আনার জন্য টাইটানিয়াম অক্সাইড, জিঙ্ক অক্সাইড, ক্যালসিয়াম সালফেট ইত্যাদি দেওয়া হয়। আজকাল কোনো কোনো পাউডারে সানস্ক্রিনও মেশানো হচ্ছে। ফেস পাউডারের মূল উদ্দেশ্য হল এতে মুখের ছোটোখাটো দাগগুলো ঢাকা পড়ে আর মুখটা ঘামে তেল-চকচকে দেখায় না। এবং আমাদের দেশে একটা অকথিত উদ্দেশ্য তো থেকেই যায়, যেন মুখ একটু সাদাটে একটু ফরসা দেখায়। দামি পাউডার মানেই যে কাজের, সেরকম ভাবার কোনও ভিত্তি নেই।

এবার বলি বেবি পাউডারের কথা। এর মূল উপাদান সাধারণ পাউডারের মতোই, তার সঙ্গে নানা সুগন্ধি-দ্রব্য আর বীজাণুনাশক যোগ করা আছে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিরাপত্তা। যাতে কসমেটিক হিসেবে স্বীকৃত মানের ট্যাল্ক আছে এমন পাউডারকে আমেরিকার এফ ডি এ সংস্থা 'নিরাপদ বলে ভাবা যেতে পারে' এমন অভিধা দিয়েছে, এবং এফ ডি এ এসব বিষয়ে বেশ কঠোর। কিন্তু বেবি পাউডার হিসেবে বিক্রি হচ্ছে বলে তার সুগন্ধী-দ্রব্য বা বীজাণুনাশকগুলোতে কোনো বাচ্চার অ্যালার্জি হবে না তা ভাবার কোনো কারণ অবশ্যই নেই। আর একটা ব্যাপারে সাবধানে থাকাই ভালো। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকে পাউডার বিপদ ঘটাতেই পারে, বিশেষ করে বাচ্চাদের পক্ষে। সেটা অবশ্য পাউডারের দোষ নয়, ব্যবহারের দোষ।

ঘামাচি:

সর্বশেষ প্রসঙ্গ হল ঘামাচি আর পাউডার। সরলতার স্বার্থে এই আলোচনায় ঘামাচি বলতে সাধারণ ঘামাচি বোঝাব, যার ডাক্তারি নাম হল মিলিয়ারিয়া রুব্রা। যে ঘামাচি গরমে আমাদের জ্বালায়, তার প্রায় সবগুলোই হল এই মিলিয়ারিয়া রুব্রা। ঘামাচিতে পাউডার বা অন্য কোনো বস্তু কতটা কাজ করবে, বা আদৌ কাজ করবে কিনা, সেটা বুঝতে গেলে ঘামাচি জিনিসটা সম্পর্কে দু-চারটে কথা আমাদের জানতে হবে। অতিরিক্ত ঘামের ফলে ঘর্মগ্রন্থিগুলোতে কিছু পরিবর্তন হয়, এবং তার ফলে এই গ্রন্থিগুলোর মুখ যায় বন্ধ হয়ে। এদিকে গ্রন্থির ভিতরে ঘাম তৈরি হওয়া তখনি বন্ধ হয় না। ফলে জমে থাকা ঘামের চাপে গ্রন্থির ঘাম বের করার নালি যায় ফেটে, ঘাম ত্বকের তলায় ছড়িয়ে পড়ে, এবং স্থানীয় প্রদাহ দেখা দেয়। পরে বীজাণু সংক্রমণ হয়ে সমস্যা আরো ঘোরালো হতে পারে।

খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন, শেষ এই বীজাণু সংক্রমণ পর্বটির আগে পর্যন্ত ঘামাচি-নাশক পাউডার, বা যে কোনো ওষুধের ভূমিকা অতীব নগণ্য। ঘাম হওয়া বন্ধ করাটাই একমাত্র চিকিৎসা। অর্থাৎ ঠাণ্ডা রাখতে হবে শরীরকে। কাজ কম, খোলামেলা পোষাক বা যতটা সম্ভব না-পোষাক, স্নান, এইসবই হল চিকিৎসা। ক্যালামিন লোশন বা অতি নিম্ন মাত্রার স্টেরয়েড মলমের কথাও বলা হয় ত্বকরোগ-চিকিৎসার বইগুলোতে, পাউডারের কথা বিশেষ বলা হয় না। হবার কথাও নয়, কেননা পাউডার মাখলে কিঞ্চিত আরাম হয়, এই পর্যন্তই। ঘামাচিতে বীজাণু সংক্রমণ হলেও ঘামাচি-নাশক পাউডারে যেটুকু জীবাণুনাশক দেওয়া আছে তা বড় কাজে লাগে না। আর মুশকিলের দিকটা হল, আমরা যেমন বেবি-ফুডের ক্ষেত্রে দেখেছি, ডাক্তারি বইতে 'কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়া গেলেও যেতে পারে' এটুকু বলা থাকলেই, বড় বড় কোম্পানির মাল সেই সুযোগে ঢালাও বিক্রি করা হয়, এবং ডাক্তারি বই-এর দু-একটা লাইন ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়।

কি বললেন, এবার গরমে ঘামাচির পাউডার লাগাবেন না? ঠিক সেটা কিন্তু আমি বলিনি, বলেছি খালি এটুকুই যে পাউডারে আরামের চাইতে বেশি কিছু আশা করবেন না, আর পাউডার ব্যবহারেও সামান্য মাত্রায় সতর্কতা জরুরি।

Rotary Club of Burdwan Greater
(R. I. Ditrict 3240)
offers

Miles to Go

An awareness-promoting booklet
on
HIV-AIDS,
With special reference to the
Indian scenario till May 2008
NGOs, Science Clubs and other
non-profit organizations working
in the health sector may apply for
a free copy to:
Rtn. **Dr. Mainak Mukherjee MPHFI**
Purushottam Sarani, Burdwan -
713101
(dr.mainak@gmail.com)
9434008446

জাপানে ভূমিকম্প ও পরমাণু কেন্দ্রে দুর্ঘটনা, কিছু প্রশ্ন

সুজয় বসু

জাপানে গত ১১ই মার্চ একই সঙ্গে ভূমিকম্প ও ৎসুনামীর আঘাতে জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অপরিসীম। কিন্তু তা ছাপিয়ে এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে বিধ্বস্ত দেশটি। জাপানের পূর্ব ও পশ্চিম দুই উপকূলেই বেশ কয়েকটি করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। ও দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম বসানো হয় ১৯৬৬ সালে কিছুটা পরীক্ষামূলকভাবে। ১৯৭১ সাল থেকে প্রসারের শুরু, ভূমিকম্প কেন্দ্র উপকূল থেকে ছিল মাত্র একশ' কিলোমিটার দূরে। তীব্র কম্পনে, রিখ্টার স্কেলে ৮.৯ তীব্রতার যা বর্তমান প্রজন্মের জাপানিরা প্রত্যক্ষ করে নি, নিকটের উপকূল শহরের ফুকুশিমার প্রবল ক্ষয়ক্ষতি করে এবং একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উপকূলে বসানো চারটি বড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের। এই ক্ষতির ধরণ সাধারণ ধ্বংস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তা থেকে যে কতটা বিপদ হবে তার সঠিক পরিমাপ করা এখনই সম্ভব নয়।

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপের সাহায্যে বাষ্প তৈরি করে তা দিয়ে টারবাইন জেনারেটর ঘুরিয়ে তৈরি হয় বিদ্যুৎ। তাপ থেকে বিদ্যুতে রূপান্তরের দক্ষতা সাধারণ কয়লা বা তেল-জ্বালানি কেন্দ্রগুলির তুলনায় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কম বলে এই কেন্দ্রগুলি চালাতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয় বাড়তি বর্জ্য তাপ অপসারণের জন্য। এই কারণেই উপকূল অঞ্চলই এই জাতীয় কেন্দ্র বসানোর ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রাধিকার পায়। জাপান দেশটি সমুদ্র দ্বীপ সমষ্টি। ফলে জাপানের মোট ৫৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অধিকাংশই উপকূল অঞ্চলে এবং পরমাণু বিদ্যুৎ মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ৩০ শতাংশের কম।

প্রযুক্তি চর্চায় সারা বিশ্বে জাপানের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই চর্চাকে ধারাবাহিকভাবে অগ্রাধিকার দিয়েই প্রাকৃতিক সম্পদে অতি দুর্বল এই দেশটি বিশ্বের অর্থনীতিতে দ্বিতীয় স্থানে এসেছে ১৯৭০-এর দশকে। জাপান ভূমিকম্প প্রধান। এর মোকাবিলায় পূর্ত নির্মাণ ও গঠনশৈলীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে প্রতিঘাত ও কম্পনসহ সেতু, অট্টালিকা তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান ভূমিকম্পে বহুদূর থেকে দৃশ্যমান উঁচু 'টোকিও টাওয়ার'-এর ক্ষতি হয়েছে সামান্যই। যন্ত্রাদি তৈরি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অন্যান্য শিল্পে জাপানের অগ্রগতি অব্যাহতই আছে।

বর্তমান ক্ষেত্রে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে ফুকুশিমার চারটি চুল্লিতে এবং অন্যত্র একটিতে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটেছে। শীতক জলের সাহায্যেই চুল্লিগুলির তাপমাত্রা যথাযথ রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। চুল্লির জ্বালানিগুলি একটু বিশেষ ধরনের। ইউরেনিয়াম-অক্সাইড-এর মিহি গুঁড়ো দিয়ে আধ ইঞ্চির মতো ব্যাসের ও ইঞ্চিখানেক লম্বা 'পেলেট' বা দণ্ডাংশ ছাঁচে তৈরি করা হয়। সেগুলি খুব উঁচু তাপে পুড়িয়ে শক্ত আকার দেওয়া হয়। এই 'পেলেট'গুলি ১০/১২ ফুট লম্বা জিরকোনিয়াকের মিশ্র ধাতুর পাতলা নলের ভিতর পুরে একটা জ্বালানি দণ্ড তৈরি হয়। দেড়শর'র মতো জ্বালানিদণ্ড তৈরি হয়। ১৫০-র মতো জ্বালানিদণ্ড চৌকোণা প্লেটের উপর একটু ফাঁক ফাঁক করে বসানো হয়—নীচে উপরে প্লেট দিয়ে শক্ত করে আটকে রেখে তৈরি হয় একটি জ্বলানিগুচ্ছ। উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কতগুলি গুচ্ছ থাকবে। দণ্ড ও গুচ্ছগুলি এমনভাবে সাজানো হয় যাতে তাদের মাঝখান দিয়ে জল সহজে যেতে পারে। প্রধানত দু'ধরনের চুল্লি হয়—(ক) চাপিত জল চুল্লি

(প্রেসারাইজড ওয়াটার রিয়্যাকটর), ও (খ) ফুটন্ত জল চুল্লি (বয়েলিং ওয়াটার রিয়্যাকটর)। প্রথমটিতে জলের তাপমাত্রা ১০০° সেলসিয়াসের অনেক উপরে রাখা হয় খুব উঁচু চাপে (চাপ বেশি হলে জল ফোটে অধিক তাপমাত্রায়)। এই অতি উত্তপ্ত জলের সাহায্যে একটি বিশেষ আধারে সাধারণ চাপে জল ফুটিয়ে বাষ্প করা হয় এবং সেই বাষ্প দিয়েই টারবাইন-জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। দ্বিতীয় ধরনের চুল্লিতে ভিতরকার জলকে ফুটতে দেওয়া হয়—চুল্লির মধ্যেই তৈরি হয় বাষ্প এবং এই বাষ্প দিয়েই চলতি প্রথায় বিদ্যুৎ তৈরি হয়। এই বাষ্প টারবাইন থেকে বেরিয়ে আসার পর শীতল জলের সাহায্যে ঘণীভবনে আবার জলে রূপান্তর করে চুল্লিতে পাঠানো হয়। উভয় ধরনের চুল্লিতেই শীতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নিয়ন্ত্রিত বিভাজনের ক্ষেত্রে চুল্লির ভিতরে ও বাইরে জলের সরবরাহ সর্বদাই চালু রাখতে হবে। চাপিত জল ও ফুটন্ত জল চুল্লিতে জলের অভাব ঘটলে, জ্বালানিদণ্ডগুলি জলের বাইরে থাকলে, বিভাজনের হার বাড়ে এবং আরও বেশি তাপ উৎপন্ন হয়। এই অবস্থা বেশ কিছু সময় চললে তাপ বাড়তেই থাকে জ্বালানিদণ্ডগুলি একসময় গলতে শুরু করে। চুল্লি বা পরমাণু কেন্দ্রের গর্ভকক্ষটি তৈরি হয় ৮/১০ ইঞ্চি বা ২০/২৫ সে মি পুরু পেটানো ইস্পাতে। দণ্ডগুলি গলে গিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে 'আংশিক গলন' বা 'পার্শিয়াল মেল্টডাউন' বলে। এই পর্বে অতি তেজস্ক্রিয় জ্বলানিগুচ্ছ গলে গিয়ে চুল্লির নীচে জমা হয়, বাইরে বেরিয়ে আসে না। শীতক জলের অভাব চলতেই থাকলে গলন্ত দণ্ডগুলি নীচে জমা হতে হতে একসময় চুল্লির নীচটাও গলিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। এই অবস্থাকে বলে 'সার্বিক গলন' বা 'টোটাল মেল্ট ডাউন'। এই পর্বে অত উঁচু তাপে তেজস্ক্রিয় জ্বালানি দণ্ডগুলির বাষ্পীভবন শুরু হবে। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে সেই তীব্র বিষবাষ্প, বাতাস বাহিত হয়ে অনতিকালের মধ্যেই দূষিত করে তুলবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেমনটি হয়েছিল ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুর্ঘটনায়। সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে এই দুর্ঘটনায় ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু করে ২০১০ সাল অবধি প্রাণ হারিয়েছেন ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার জন, অধিকাংশই কর্কট রোগে।

চুল্লিতে জলের অভাব হলে আর একটি বিরাট গুরুতর বিপদ দেখা দেবে। উঁচু তাপমাত্রায় জ্বালানিদণ্ডগুলির বাইরের আবরণ জিরকনিয়ামের মিশ্র ধাতুর সঙ্গে বাষ্পের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি হবে হাইড্রোজেন গ্যাস। চুল্লি থেকে অতি হালকা এই গ্যাস বেরিয়ে এসে জমা হবে নিশ্ছিদ্র চুল্লি কক্ষে যা ১ মিটারেরও বেশি পুরু কংক্রিটের তৈরি, অতিশয় শক্তপোক্ত কারণ তেজস্ক্রিয়তার পুরো বিষয়টাই রয়েছে এর ভেতরে। এদিকে তাপমাত্রা চুল্লিতে বেড়ে চলেছে, জল শুকিয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগত অতি দাহ্য হাইড্রোজেন গ্যাস চুল্লিকক্ষে জমছে তার চাপও বেড়ে চলেছে। অবশেষে ঐ চাপও তাপমাত্রা ক্রান্তিবিন্দু ছাড়ালেই ঘটবে বিস্ফোরণ যার তীব্রতায় গুঁড়িয়ে যাবে ঐ দৃঢ় চুল্লিকক্ষ যেমন ঘটেছে জাপানে। তেজস্ক্রিয় গ্যাস বাইরে বেরিয়ে এসে অসুস্থ করে তুলবে জনপদের পর জনপদ। এর নিয়ন্ত্রণ কী ভাবে হতে পারে তা জানা নেই কারও।

জাপানের ফুকুশিমার চুল্লি চারটেই 'ফুটন্ত জল চুল্লি'। ১৯৭০-এর দশকে আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি থেকে কিনে এনে বসিয়েছিল টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি বা 'টেপকো'। চুল্লিগুলির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বন্ধ করে দেওয়াই প্রথা এই বয়স্ক চুল্লিগুলির। এই মার্চ মাসেই বন্ধ করা হচ্ছিল একটি। তার আগেই ঘটে গেল এই মারাত্মক দুর্ঘটনা। এখন অবিরত চেষ্টা চলছে যতটা সম্ভব তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়া রোধ করাতে। কারণ তেজস্ক্রিয়তার বিষ মোকাবিলার ব্যবস্থাদি করে ওঠা যায় নি। এই বিষ দেহস্থ হলেই অপসৃত হবে তা নয়। মৌলধর্ম অনুযায়ী এই বিষ কমবে অর্ধজীবনের হিসেব ধরে: তেজস্ক্রিয় আইওডিন-এর অর্ধজীবন ৮ দিন, প্লুটোনিয়ামের অর্ধজীবন প্রায় ২৪ হাজার বৎসর।

ভারত সরকার পরমাণু চুল্লিগুলির নিরাপত্তা যাচাই করছেন বলে আশ্বস্ত করেছেন দেশবাসীকে। কারা যাচাই করছেন? আনবিক শক্তি বিভাগের সরকারি বিজ্ঞানীরা, সবাই 'অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটারি বোর্ড'-এর পদাধিকারী। ইতিপূর্বে এই বোর্ডটির প্রধান ডঃ এ গোপালকৃষ্ণণ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর অনুসন্ধানের একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন—তাতে ১৩২টি বিচ্যুতির বিবরণ ছিল। প্রতিবেদনটিতে সঙ্গে সঙ্গেই একটি 'অতি গোপনীয়' ছাপ মেরে কোথায় রাখা হয় তার সন্ধান বাইরের কেউই পান নি। বিচ্যুতিগুলির প্রতিকার কি হল তাও কেউ জানেন না।

জাপানি পরমাণুবিদ্যুৎশিল্পে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সারা বিশ্বে প্রথম শ্রেণীর মানতে বাধা নেই। তাঁরা এই বিকট বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে অসহায় বোধ করছেন। ইতিপূর্বে আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ড কেন্দ্রে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার চেরনোবিল কেন্দ্রের দুর্ঘটনায় অনুরূপ অবস্থাই হয়েছিল আমেরিকান ও সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের।

এই পরিস্থিতিকে চিরকালের জন্য দূরে রাখতে ভারতের পরমাণু চুল্লিগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। এতে এ দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন কমবে মাত্র ৩ শতাংশ। এই হ্রাস জনজীবনে যে কোনও প্রভাবই ফেলবে না তা দায়িত্ব নিয়ে বলা যায়।

এখনই সারা দেশ জুড়ে দাবি উঠুক পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার।

—১৭ই মার্চ, ২০১১।

উত্তরণ

মানসিক স্বাস্থ্য প্রযত্ন

৮৯ ডি এন মিত্র লেন, খোসবাগান, বর্ধমান- ৭১৩১০১
যোগাযোগ: সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৬০৯৫৮২০৩২

পুস্তক পরিচিতি: সুস্থভাবে বাঁচার জন্য। ষড়ানন পণ্ডা। মূল্য: ২৪ টাকা। প্রাপ্তিস্থান: সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া স্টেশন

সাধু উদ্যোগ

ষড়ানন পণ্ডা পেশায় স্কুলশিক্ষক। থাকেন পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং অন্তর্গত এড়াল গ্রামে। আর পাঁচজন শিক্ষকের মতো ছাত্র পড়ানোর কাজটুকুর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে উনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বৃহত্তর ক্ষেত্রে। আশপাশের মানুষজনকে যুক্তিবাদে দীক্ষিত করার জন্য কয়েক দশক ধরে কোমর বেঁধে লড়ছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন তিন-তিনটি সংগঠন—চাউলকুঁড়ি গণবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, এড়াল বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং সবং সায়েন্স সোসাইটি। শুধু এই তিনটি বিজ্ঞান সংগঠনেই থেকে নেই তিনি। মেয়েদের ও ছেলেদের স্কুল, গ্রামীণ পাঠাগার, ডাকঘর থেকে সজলধারা—সব কিছুর মধ্যেই জড়িয়ে থাকেন। মেদিনীপুর জেলার প্রথম মরণোত্তর চক্ষুদান ও দেহদান, বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা, পণ না নিয়ে বিয়ে—এরও নেপথ্যে সেই ষড়ানন বাবু। সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি প্রকাশ করেছেন বই 'সুস্থভাবে বাঁচার জন্য, সঠিক ও মুক্তচিন্তার সংকলন।' এতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নীতিবোধ, শুভ সংস্কার ইত্যাদি বিষয়কে ছড়ায় ধরেছেন তিনি। তাঁর যুক্তি, বইটি শিশুদের জন্য এবং শিশুরা ছড়া ভালবাসে। তবে ছড়ার পাশাপাশি গদ্যও আছে, আছে বহু ছবি, সারণি। সব মিলিয়ে দারুণ কার্যকর এক উদ্‌যোগ। ৬০-৭০ পাতার মধ্যে তিনি বহু তথ্য একত্র করেছেন, যেগুলি সবার জানার, বিশেষ করে গ্রামের মানুষের। এই বইটির জন্য লেখকের অযুত সাধুবাদ প্রাপ্য।

পরিশেষে দু-একটা অপ্রিয় কথা বলতেই হয়। প্রথমত, ছড়াগুলোকে বক্তব্য প্রধান করতে গিয়ে ছড়ার ছন্দ নষ্ট হয়েছে। এসেছে শব্দের গোঁজামিলও। এ ব্যাপারে আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। যেমন ২৯নং ছড়ায় লিখেছেন—"জিয়ারডিয়া আর হুক ওয়ার্ম,/দেহের পক্ষে খুবই 'হারাম'।" ওয়ার্ম-এর সঙ্গে মেলানোর জন্য 'হারাম' কথাটার ব্যবহার করেছেন, যা অর্থহীন। হারাম মানে শুয়োর। মুসলমান ধর্মমতে অবৈধ, অপবিত্র। তথ্যগত ভুলও বেশ কিছু রয়েছে। যেমন, ৪৫নং ছড়ায় 'বিড়াল ডিপ্‌থেরিয়া'। বিড়ালের সঙ্গে ডিপথেরিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয়ত, ২নং ছড়ায় তিনি লিখেছেন—'রেডিও, টিভি, টেপ, ফ্রিজ, জেট বিমান,/এয়ার কন্ডিশান ও চন্দ্র অভিযান,/সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের জীবন,/সবই তো ভাই বিজ্ঞানের অবদান।/সবার কাছে পৌঁছবে কবে এর আস্বাদন?/কবে সবে করবে যাপন সুস্থ সুখী জীবন?' এইগুলো পেলেই আমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের জীবন পেতে পারি? মন্তব্যটা অতি সরলীকরণ হয়ে গেছে।

তৃতীয়ত, বইয়ের প্রথমেই রয়েছে ষড়াননবাবুকে পুরস্কৃত করার ছবি, মানপত্রের প্রতিলিপি ও ছবি। তারপর কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের শংসাপত্র। যতদূর জানি, ষড়াননবাবু দীর্ঘদিন নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াই করছেন। এ কাজে তাঁর সাফল্যও ঈর্ষণীয়। এই কাজ দু-চারজন নামীদামি লোকের শংসাপত্র-নির্ভর নয়। তার চেয়ে অনেক অনেক বড়। শংসাপত্রদাতাদের চেয়ে প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে তিনি অনেক এগিয়ে। কারণ এতে ডাক্তার মানস ভূঞার মতো লোকের শংসাপত্র রয়েছে, যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়া সত্ত্বেও আঙুলে একাধিক রত্নখচিত আংটি পরেন, কথায় কথায় ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানান। গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেন বলে ষড়াননবাবু কি হীনমন্যতায় ভোগেন? না হলে, তাঁর এত শংসাপত্র বা উৎসাহদাতার নামের তালিকায় 'ডাঃ' আধিক্য কেন?

সমীরকুমার ঘোষ

গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদে আয়োজিত আলোচনা সভা

২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের প্রাক্কালে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০ গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ আয়োজিত আলোচনা চক্রে 'বাংলায় প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকার মুদ্রণ সংখ্যা কম কেন' বিষয়ে পরিষৎভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। অনেকেই আলোচনায় অংশ নেন। এক আলোচক বলেন, 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এক উল্লেখযোগ্য পত্রিকা উৎস মানুষের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে।' শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন বলেন, এই তথ্যটি একেবারেই ভুল। তিনি একথাও বলেন যে, উৎস মানুষ জানুয়ারি ২০১১ সংখ্যাটি কলকাতা বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর মতে পত্রিকাটির অবস্থানগত এতটুকুও পরিবর্তন হয় নি।

বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বই পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ গড়ে উঠেছে। এখানে স্থান পেয়েছে উৎস মানুষ। বাঙলা বিজ্ঞান, সাহিত্যচর্চা ও জনবিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এটি একটি অভিনব প্রয়াস। আগ্রহী যে কেউ যোগাযোগ করতে পারে—দীপক কুমার দাঁ, গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ, পো:- খাঁটুরা, জেলা- উত্তর ১৪ পরগনা, ডাকসূচক-৭৪৩২৭৩ (রেল স্টেশন-বারাসাত - বনগাঁ শাখায় গোবরডাঙ্গা)। দূরভাষ - ০৩২১৬-২৪৯২৯৮, চলভাষ - ৯৪৭৪১৯২৭৯৯। সোমবার বাদে প্রতিদিন এই পরিষৎ খোলা থাকে বেলা ২ টো থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী

এপ্রিল-জুন২০১১

স্মরণ

সার্দ্ধ জন্মশতবর্ষে চিকিৎসক নীলরতন সরকার

১৮৬১ সালকে বাঙালীর কাছে যাঁরা স্মরণীয় করে রেখেছেন চিকিৎসক নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) তাঁদেরই একজন। এই মহান চিকিৎসকের সার্দ্ধ জন্মশতবর্ষে এবং তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত হাসপাতালকে ঘিরে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস-এর তিন তলায় 'বই-চিত্র' সভাঘরে গত৫ মার্চ-এর সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চিকিৎসক নীলরতন সরকারের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে সুদীর্ঘ আলোকপাত করেন ডাঃ শ্যামল চক্রবর্তী ও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত এই চিকিৎসকের গবেষণায় মগ্ন মাধবেন্দ্র নস্কর। এই দিনের সন্ধ্যায় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে নিয়ে ছোটন দত্তগুপ্তের নবনির্মিত তথ্যচিত্র 'রত্নগর্ভা' প্রদর্শিত হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা সংক্রান্ত বেশ কিছু চমকপ্রদ ঘটনা ও অজানা তথ্য উল্লিখিত আছে এই তথ্যচিত্রে।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ও নীলরতন সরকারের জামাতা কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নীরতন সরকারকে নিয়ে লেখাটির পুনর্মুদ্রণ বই-চিত্র ও সুতানুটি পরিষদ যুগ্মভাবে প্রকাশ করে। এটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (বর্ষ-১৮, সংখ্যা-৪)।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অভিধান সংকলক, অনুবাদক ও প্রবন্ধকার শ্রী আশীষ লাহিড়ী।

সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী।

দাঁতের চিকিৎসা করছেন গ্রামের নিরক্ষর মহিলারা

রাজস্থানের আজমের জেলায় তিলোনিয়া গ্রামের দুই মহিলা—ভাওরি দেবী ও কেশরি দেবী। বয়স—৫০। জীবিকা বলতে ক্ষেতমজুরি আর কখনো সখনো দাইগিরি। স্কুলের চৌকাঠ মাড়ানোর সুযোগ হয়নি। এরা এখন দাঁতের ঘোরালো চিকিৎসা, রুট ক্যানাল (Root Canal Operation) অস্ত্রোপচারের মতো জটিল চিকিৎসার তালিম নিচ্ছেন।

তিলোনিয়ার 'বেয়ারফুট কলেজে' ইতালি থেকে এসেছিলেন একদল দাঁতের ডাক্তার। স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে কাজ শুরু করে দলটি। শুরু হয় দাঁতের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া আর দাঁতের স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার কাজ। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বিষয়টাকে এমন সহজভাবে শেখানো যাতে গ্রামের লেখাপড়া না-জানা মহিলারাও তা শিখে নিতে পারেন। আর এই উদ্দেশেই তাঁরা এমন মহিলাদের বাছতে থাকেন, যাঁরা রক্ত দেখে ঘাবড়ে যান না। বছর চারেক আগেই পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়। তখন থেকেই ভাওরি দেবী আর কেশরি দেবীর প্রশিক্ষণ নেওয়ার শুরু। ইতিমধ্যে দাঁত তোলা, দাঁতের গর্ত বোজানোতে এঁরা বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছেন। এখন শিখছেন রুট ক্যানাল পদ্ধতি।

সংবাদ সূত্র:টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৭/১/২০১১

চিত্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র

বাবুরবাগ, বর্ধমান

উদ্বোধন - ১ নভেম্বর ২০১১

যোগাযোগ- ৯৪৩৪০ ০৮৪৪৬

উৎস মানুষ আপনার কথা বলে,
আপনিও উৎস মানুষের কথা বলুন।

বিজ্ঞাপন দিন এবং লেখা পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করুন। আমরা আবার গ্রাহক করার কথা ভাবছি। আশা করি আপনারা এতে সাহায্যের হাত বাড়াবেন।

উৎস মানুষ পত্রিকার সডাক গ্রাহক হতে হলে:—

১। সডাক গ্রাহক চাঁদা বছরে ৬০ টাকা। পত্রিকা 'আন্ডার সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং'-এ পাঠানো হবে।

২। বছরে ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়; জানুয়ারি-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর।

৩। বছরের যে কোনও সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে। গ্রাহক চাঁদা হাতে পাওয়ার সময় যে সংখ্যা প্রকাশিত হবে, তার পরের সংখ্যা থেকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

৪। চাঁদা পাঠাবেন কীভাবে—

United Bank Of India,
College Street Branch,
Kolkata-7000073
Utsa Manush. sb account no.
0083010748838।

এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে আপনারা চেক অথবা টাকা জমা দিয়ে দেবেন এবং ফোন করে কিংবা মেল করে আপনার নাম ঠিকানা আমাদের জানিয়ে দিলেই আপনাকে গ্রাহক করে নেওয়া হবে। অথবা চিঠি লিখেও জানাতে পারেন। কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে চান তা জানাবেন। আমাদের ফোন নং, ই-মেল আই ডি এবং যোগাযোগের ঠিকানা সব কিছু পত্রিকাতেই পেয়ে যাবেন।

উৎস মানুষ-এর প্রাপ্তিস্থান

কলকাতা: বই-চিত্র (কফিহাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙ্গা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়)। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস (দক্ষিণাপন-এর উল্টোদিকে)। **বর্ধমান**: জ্ঞানতীর্থ (বি সি রোড), বুড়োরাজ পুস্তকালয় (দত্ত সেন্টার), নবীনা (বাসযাত্রী বিশ্রাম ভবন, কার্জন গেট), হুইলার (রেলওয়ে স্টেশন)। **আগরতলা**: সৈকত প্রকাশন। **দুর্গাপুর**: অক্ষয় বুক স্টল (সিটি সেন্টার), সিটিসেন্টার বুক স্টল, সিটি বুক হাউস (সিটি সেন্টার), নব পুস্তকালয় (স্টেশন বাজার), হুইলার (রেল স্টেশন)। **বোলপুর**: রেলওয়ে স্টেশন। **কাটোয়া**: ভাস্কর এন্টারপ্রাইজ (কাছারি রোড)। **সিউড়ি**: দেশবন্ধু (ইন্দ্রপল্লী)। **আরামবাগ**:ছাত্রমহল (আরামবাগ ফাঁড়ির উল্টোদিকে)।

চিঠিপত্র

প্রিয় সম্পাদকমণ্ডলী,
উৎস মানুষ
কলকাতা

জানুয়ারি ২০১১ সংখ্যায় এক ছোট্ট প্রতিবেদনে নার্সিংহোমে সেপটিসিমিয়ার প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আপনারা লিখেছেন, 'কলকাতার অনেক নার্সিংহোম ও হাসপাতালেই আইসিসি ইউ-তে ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যাকটেরিয়া পুষে রাখা হয়...।' প্রতিবেদনটির লেখক কে, কী তাঁর পরিচয় ইত্যাদির কিছুরই উল্লেখ না থাকায় ধরে নেওয়া যায় লেখাটির দায়িত্ব পত্রিকা নিজেই নিচ্ছে। প্রশ্ন হল, এরকম আলপটকা একটা মন্তব্যের দায়ও উৎস মানুষ নিজেই নিচ্ছে কি? ব্যাকটেরিয়া 'পুষে রাখা হচ্ছে' না কি অন্যান্য ঘটনাচক্রে সংক্রমণ বাড়ছে, সে বিষয়ে কোনও তথ্য প্রমাণ আছে কি?

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে কলকাতার চিকিৎসালয়গুলোতে সেপটিসিমিয়ার হার দক্ষিণ ভারতের তুলনায় অনেক বেশি তবু এত বড় কথাটা বলার আগে একটা 'হয়ত' বা 'সম্ভবত' কি যোগ করা যেত না? উৎস মানুষ আন্দোলনের সঙ্গে কম বেশি আড়াই দশক কছে-দূরে জড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতায় এতদিন এটাই তো মনে হত যে এই পত্রিকা তথ্য ছাড়া, যুক্তি ছাড়া, প্রমাণ ছাড়া কথা বলে না। তাহলে?

কলকাতার হাসপাতাল বা নার্সিংহোমগুলো রোগীর চিকিৎসা বা যত্নের ব্যাপারে যে সর্বদা নিখুঁত অথবা নার্সিংহোমে যে রোগীর গলা কেটে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা হয় না, অথবা তারা যে সেপটিসিমিয়া-অ্যান্টিবায়োটিক-ভেনটিলেটরের চক্রে রোগীকে ফেলে লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে উপায় করে না, একথা বলা কিন্তু এই চিঠির উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য, এই ভাষায় প্রতিবেদন প্রকাশ করার আগে পরিচালকমণ্ডলীকে আর একটু সতর্ক হতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা।

বিনীত,
মৈনাক মুখোপাধ্যায়।
২বি, বাংলার মুখ হাউসিং, কিউ ১/৬০, পাটুলি,
কলকাতা-৭০০০৯৪।

উমা

WB/EC 228 ISSN 0971-5800 R.N. 37275/80 Rs. 15.00

উৎস মানুষ ৩১ বর্ষ এপ্রিল-জুন ২০১১ ১৫ টাকা

পুস্তক তালিকা

ছাপা আছে

১. বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১) সংকলন	৩৫.০০
২. যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪০.০০
৩. বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) সংকলন	৪২.০০
৪. প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
৫. তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
৬. বাংলা বন্‌ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
৭. এটা কী ওটা কেন সংকলন	৫০.০০
৮. 'আমরা জমি দেই নি, দেব না'	১০.০০
৯. আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান সংকলন	৫০.০০
১০. আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
১১. প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
১২. বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০
১৩. শেকলভাঙা সংস্কৃতি (যন্ত্রস্থ)	

ছাপা নেই

অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে (সংকলন)
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)
স্বাস্থ্যের বৃত্ত
প্রমিথিউসের পথে
জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?
শেকলভাঙা সংস্কৃতি - ৪
হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান
সংকলন
কী আর কেন
চলতে ফিরতে
বিজ্ঞানকে মুখোশ করে
সাপ নিয়ে কিংবদন্তী
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ৪
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ (জানুয়ারি ২০০০১ম)
খাবার নিয়ে ভাবার আছে (৩য়)
লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি
নিজের মুখোমুখি
ছেচল্লিশের দাঙ্গা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬

ফোন নং- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮, ৯৪৩৩৮৮৮৮৬২, ৯৮৩১৪৬১৪৫৬

website: www.utsamanush.com

email: utsamanush1980@gmail.com

utsamanush1980@hotmail.com

উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক কলকাতা-৭০০০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং শান্তি মুদ্রণ ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, দূরভাষ-৯৪৩৩০৯৯৯৩১ হইতে মুদ্রিত। বাঁধাই- নিবারণ সাহা।